

সূর্য আবার উঠবে

সুশীল চন্দ্র দেবশর্মা

সূর্য আবার উঠবে

[মাষ্টারদা সূর্য সেনের উপর নাটক]

সুনীলচন্দ্র দেবশর্ম্মা

পরিবেশক

এন ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী,
বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩।
ফোন : ২৩৯১।

প্রথম সংস্করণ : ২৩শে শ্রাবন, রবিবার, রাখী পূর্ণিমা,
১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

মূদ্রাকর : শ্রীগৌর সাহা, ন্যাশানাল প্রেস,
লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনী, নবপল্লী,
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ : শ্রীনিরঞ্জন জানা।

মূল্য মাত্র—১৫ টাকা

ওঁ

যাঁর একান্ত ধ্যানজ্ঞান ও সাধনা ছিল এই নাটকটি রচনা, প্রযোজনা ও প্রকাশনা, যিনি কার্য সম্পূর্ণ হবার অব্যবহিত পূর্বে আকস্মিক ভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন—সেই ৬অবিনাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মত তাঁরই অনলস সাধনার ফল এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হল।

মুখবন্ধ

স্বাধীন ভারতের বয়স চল্লিশ বছর হতে চলল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—সেও আজ সাতান্ন বছরের পুরানো ঘটনা। কিন্তু আজও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, তার দুই ধারার বিরোধ ও পরিণতি নিয়ে বিভ্রান্তি আর মতদ্বৈধতার অন্ত নেই।

এর পিছনে আছে—জীবনাদর্শের বিভিন্নতা, জীবন দর্শনের বিভিন্নতা ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির অনভিজ্ঞতা।

এই নাটকটি 'চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি—বারাসত শাখা'র অনুরোধক্রমে রচনা করা হয়েছে। তাই, এই নাটকে চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসই তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটক চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হলেও সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবাদর্শগত রূপরেখাটিও ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলবার সময়ে—'পরবর্তী যুগে আমরা কেমন ভারত গড়ে তুলতে চাই'—সে বিষয়ে ছিল নানা বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা। কোন দল ভারতবর্ষকে সৈনিকাধীন এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কোন দল চেয়েছিলেন—গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিতে, কেউ কেউ চেয়েছিলেন—যন্ত্রসভ্যতার বিকাশস্থল ইউরোপের ধাচে। এ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ার আওয়াজও সে যুগে শোনা গিয়েছিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার রূপরেখার বিষয়েও যথেষ্ঠ মতপার্থক্য ছিল। যথা ঃ—স্বরাজ, পূর্ণস্বাধীনতা, সীমিত শাসন অধিকার ইত্যাদি। পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্যটি প্রায় কাছাকাছি ছিল। কিন্তু সব থেকে বড় বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল পথ বা কৌশল নিয়ে। হিংসা, অহিংসা, সশস্ত্র-অভ্যুত্থান, অসহযোগ—ইত্যাদি নানা মতপার্থক্য। এ প্রসঙ্গে যে মনোভাবটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছিল তা হল ঃ—"হিংসা ভারতের আদর্শ নয়,

ভারতের আদর্শ—অহিংসা"। এই আদর্শের অনুকূল মনে ক'রে নিরস্ত্র-স্বাধীনতা সংগ্রামের তত্ত্ব বিকশিত হল। এমন কি ভারত-বর্ষের সর্বাপেক্ষা আদৃত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবত গীতার নতুন ভাষ্য লেখা হল। সে ভাষ্যে এই প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হল যে:— 'শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান অর্জুনকে যে বারবার যুদ্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছেন—তা দৈহিক যুদ্ধ নয়, বরং আত্মিক যুদ্ধ।' এই প্রসঙ্গে গরুড় পুরাণ অন্তর্গত গীতাসার অংশ থেকে শ্রীভগবান উক্ত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারছিনা।

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরমং সুখম্।
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা ত্বহিংসা সা প্রকীর্তিতা॥ ৩

বঙ্গানুবাদ:—অহিংসা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, অহিংসাই পরম সুখ। কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে হিংসা বিহিত হয় তাহাও অহিংসা বলিয়া কীর্তিত হয়। ৩

যথা নাগপদেহন্যানি পদানি পদগামিনাম্।
সর্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে।
এবং সর্বং হি হিংসায়াং ধর্ম্মার্থমপিধীয়তে॥ ৪

বঙ্গানুবাদ:—যেরূপ পদচারিগণের সকল পদগুলিই হস্তিপদের দ্বারা পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেই রূপ ধর্ম্মার্থ হিংসার দ্বারা সমস্ত দোষই আচ্ছাদিত হয়। ৪ *

হিংসা-অহিংসা মানুষের কার্যে নেই—আছে মনোভাবে। নতুবা যে ডাক্তারবাবু মানুষের দেহে অস্ত্র প্রবিষ্ট করেন, যে সমস্ত গৃহিণী রান্নার উদ্দেশ্যে মাছ কোটেন, বহু মানুষের আহারের জন্য যে কসাই প্রতিদিন বাজারে পশু হত্যা করে, যে জল্লাদ বিচারকের নির্দ্দেশে অপরাধীকে ফাঁসীতে চড়ায় অথবা যে সৈনিক দেশরক্ষার জন্য অসংখ্য নরহত্যা করে—তাদের সকলকে হিংস্র হত্যাকারী এবং হিংসার পূজারী বলতে হয়।

যাই হোক, জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে এই রকম অস্পষ্টতা ও মতপার্থক্য স্বাধীনতা আন্দোলনের চলার পথকে করেছিল

কণ্টকাকীর্ণ। এই নাটকে সেই চলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা হয়েছে এবং যে হেতু নাটকের পটভূমি চট্টগ্রাম—তাই আন্দোলনের দুই ধারার দুই প্রধানকে খুঁজতে হয়েছে চট্টগ্রামের মধ্যেই। তবে নাটক রচনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিক ও তথ্য-নিষ্ঠ থাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বহুল প্রচারিত বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তৎকালীন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিপ্লবীর সাহায্য পাওয়া গেছে। তাঁদের সাহায্য ছাড়া এ নাটক রচনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে একথা স্মরণযোগ্য যে, নাটকে বাস্তবের তিরিশ বৎসরের ঘটনাকে তিন ঘণ্টার মধ্যে দেখাতে হয়। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখযোগ্য যে ঃ এ নাটকে মোটামুটি ভাবে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই কারণে দু'টি অতিরিক্ত দৃশ্য—সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হলেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা নাটকটিকে বৃহদাকারে অভিনয় করবেন তাঁরা যথা স্থানে ঐ দৃশ্য দু'টিকে অভিনয় করবেন।

সর্বশেষে যাঁদের উদ্যম, প্রেরণা, অকৃপণ সাহায্যে এই নাটক আজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে—সেই ৺অবিনাশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত, ৺বিজয়কৃষ্ণ আইচ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৺রাখালকৃষ্ণ দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীমণীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং ৺তেজেন্দ্রলাল দত্তকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখবন্ধ শেষ করছি।

—নাট্যকার

---

* অনুবাদক—শ্রীমৎ স্বামী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

যে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সাহায্যে এই নাটক রচিত :—

১) "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন" কর্মজীবন ও চরিত্র চিত্র।
—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ধর, এম্ এ প্রণীত, এডভান্স্ অফিস, ৭৪নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রাবণ—১৩৪১।

২) "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" —অনন্ত সিংহ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। ফেব্রুয়ারী—১৯৬৮।

৩) "নবভারত স্রষ্টা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত"
—পদ্মিনী সেনগুপ্ত, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জানুয়ারী—১৯৭৫।

৪) "আমি সুভাষ বলছি" — শৈলেশ দে, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫-২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২।

৫) "নেলী সেনগুপ্ত" —সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত, ৫৬ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩, ফোন : ২৪-২৪১৮ হইতে চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক প্রকাশিত। মহালয়া—১৩৮৩।

৬) "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" —অনন্ত সিংহ, সেন এণ্ড কোম্পানী, শিবালয়, বড়দা এভিনিউ, পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা। ৪৬-৫৮৭০।

৭) "চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা [১৮৩৭—১৯৭১]" সম্পাদনা শচীন্দ্রনাথ গুহ, গ্রন্থমেলা, এ-১২ কলেজ ষ্ট্রীট। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৪।

৮) "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী" ১৯৮০-৮১ জাতীয় উৎসবের স্মরণিকা। —প্রকাশক : চট্টগ্রাম বিদ্রোহের জাতীয় সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির পক্ষে শ্রীঅর্ধেন্দু গুহ, ১১ গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯।

৯) বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন স্মরণিকা—সম্পাদনা, শ্রীঅর্দ্ধেন্দু গুহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সংহতি সমিতি, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৩।

যে সমস্ত কলাকুশলীদের নিয়ে এই নাটকটির প্রথম চারটি অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল ঃ—

সহকারী পরিচালক ঃ শ্রীজহর মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়। আবহ সঙ্গীত ঃ শ্রীঅমল কুমার দে। আলোক সম্পাত ঃ শ্রীকৃষ্ণপদ। সাজ পোষাক ঃ ঘোষ কোম্পানী। নেপথ্য কণ্ঠ ঃ শ্রীরাজকুমার মৈত্র, শ্রীপরিতোষ সোম, শ্রীমতী নীতা মুখার্জী, শ্রীমতি শীলা ব্যানার্জী, শ্রীপান্নালাল মুখার্জী।

সূত্রধার ঃ নাটকের সূত্রধার ঃ শ্রীবেনু দত্তগুপ্ত/শ্রীমনোশীজ দাসগুপ্ত/তুষার দে। নরু ঃ শ্রমিক যুবক ঃ শ্রীগৌর সাহা/সমীর রায়চৌধুরী। রামু ঃ শ্রমিক কিশোর ঃ শ্রীতপন চাটার্জী। কালু ঃ জনৈক শ্রমিক ঃ শ্রীটুকু বিশ্বাস। বঙ্কা ঃ শ্রমিক বালক ঃ শ্রীবাবু সেন। বৃদ্ধ ঃ বৃদ্ধ শ্রমিক ঃ শ্রীঅমর রায়। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঃ প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি ঃ শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়। মহিমচন্দ্র দাস ঃ জেলা কংগ্রেস সভাপতি ঃ শ্রীঅনিল ব্যানার্জী। ত্রিপুরা সেন ঃ কংগ্রেস কর্মী ঃ শ্রীগোপাল চৌধুরী। সূর্য সেন ঃ সাম্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ঃ শ্রীরবীন বসু। অনন্ত সিংহ ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায়। নির্মল সেন ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নেলী সেনগুপ্তা ঃ যতীন্দ্রমোহনের পত্নী ঃ শ্রীমতি মিনতি চৌধুরী/শাশ্বতী রায়/শিপ্রা দে। বিনয় সেন ঃ যুবক ঃ শ্রীস্মৃতিপ্রসাদ ঘোষ। প্রেমানন্দ ঃ যুবক ঃ শ্রীঅজয় মুখোঃ। গিরিজাশঙ্কর ঃ যুবক ঃ শ্রীনিরঞ্জন জানা। সিরাজুল ঃ যুবক ঃ শ্রীনীহারেন্দু বিশ্বাস। সুখেন্দু সেনগুপ্ত ঃ যতীন্দ্রমোহনের সহকারী ঃ শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী। চারুদত্ত ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীপবিত্র মুখোঃ/শ্রীগৌর সাহা। অম্বিকা চক্রবর্তী ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীজহর মুখোঃ। নগেন সেন ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীঅশোক সেন। নবীন ঃ যুবক ঃ শ্রীস্বপন বসু। রহিম ঃ শ্রীরবীন্দ্র পাঠক। গায়ক ঃ স্বদেশী গানের প্রচারক ঃ শ্রীসুনীল মুখোঃ। ইংরাজ দারোগা ঃ শ্রীবিষ্ণু চক্রবর্ত্তী। বাচ্চা ঃ একটি বালক ঃ শ্রীসৌমেন মুখোঃ। ১ম গ্রামবাসী ঃ শ্রীকালীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। ২য় গ্রামবাসী ঃ শ্রীশেখর ঘোষ দস্তিদার। ৩য়

গ্রামবাসী ঃ শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য। ৪র্থ গ্রামবাসী ঃ শ্রীরবি পাঠক। ৫ম গ্রামবাসী ঃ শ্রীআশীষ হোড়। গণেশ ঘোষ ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীসুব্রত মুখোঃ। রজৎ ঃ যুবক ঃ শ্রীপ্রসাদ রায়। উপেন ঃ যুবক ঃ শ্রীটুকু বিশ্বাস। নরেশ ঃ যুবক ঃ শ্রীবিচ্ছু ঘোষ। বিধু ঃ যুবক ঃ শ্রীশেখর ঘোষদস্তিদার। অভিভাবক ঃ উপেনের পিতা ঃ শ্রীসুনীল কর। নন্দ ঃ অনন্ত সিংয়ের দাদা ঃ শ্রীমৃণাল চক্রবর্ত্তী। রাঙাকাকা ঃ জনৈক অভিভাবক ঃ শ্রীমহাদেব রায়চৌধুরী। মা ঃ অনন্তর মা ঃ শ্রীমতী আভা গুহ। বাবা ঃ অনন্তর বাবা ঃ শ্রীখগেন রায়চৌধুরী। ইন্দুমতি ঃ অনন্তর দিদি ঃ শ্রীমতী শাশ্বতী রায়। পুষ্প ঃ সূর্য সেনের পত্নী ঃ শ্রীমতী রীতা বসু। পুলিসের বড়কর্ত্তা ঃ শ্রীসলিল মুখার্জী/ শ্রীবিকাশ চাটার্জী। লর্ড লিটন ঃ বড়লাট ঃ শ্রীপবিত্র মুখার্জী। অনুশীলন দলের সদস্যগণ ঃ তপন, স্বপন, আশীষ। লোকনাথ ঃ সাম্যাশ্রমের সদস্য ঃ শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য/গৌর সাহা। ট্যাগরা ঃ লোকনাথের সহোদর ঃ শ্রীতারক দে। সুখেন্দু ঃ এক কিশোর ঃ শ্রীবাবু সেন। পুলিসদল ঃ শ্রীদুলাল রায় শ্রী:কবো রায়। অপারেটর ঃ শ্রীবাবু চক্রবর্ত্তী। ডি এম ঃ জেলা অধিকর্ত্তা ঃ শ্রীসুবোধ মুখার্জী। টেট্ ঃ ক্যাপ্টেন ঃ শ্রীঅজয় মুখার্জী। সার্জেন্ট ঃ শ্রীকালু চন্দ। লুইজি ঃ ডি. এম. পত্নী ঃ শ্রীমতী আভা গুহ। মিসেস ফ্যারেল ঃ অস্ত্রাগার কর্মচারী পত্নী ঃ শ্রীমতী শাশ্বতী রায়। আসানউল্লা ঃ দারোগা ঃ শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত। বাচ্চা মেয়ে ঃ শ্রীমতী শুভ্রা মুখার্জী। হরিপদ ঃ জনৈক কিশোর বিপ্লবী ঃ শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঃ শ্রীনিরঞ্জন জানা। চেয়ারম্যান ঃ কমনস্ সভার সভাপতি ঃ শ্রীগৌর সাহা। সদস্যগণ ঃ শ্রীঅশোক সেন, শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী। মিঃ টেগার্ট ঃ পুলিশ প্রধান ঃ শ্রীবিনয় ব্যানার্জী। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঃ জনৈক বৃটন ঃ মহাদেব রায়চৌধুরী/মনশীজ দাসগুপ্ত/সুজিত মহলানবীশ। ক্যাপ্টেন ঃ ইটালিয়ানজাহাজের ক্যাপ্টেন ঃ শ্রীঝন্টু চক্রবর্ত্তী। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঃ প্রথম মহিলা শহীদ ঃ শ্রীমতী শ্যামলী মণ্ডল/শ্রীমতী রীতা বসু। আইলীন ঃ যতীন্দ্র মোহনের ভাইঝি ঃ রীতা বসু। পাদ্রী ডাক্তার ঃ শ্রীদুলাল রায়।

সূর্য আবার উঠবে

প্রস্তাবনা দৃশ্য

(ভারতবর্ষের কোনও এক শহরের কোনও এক রাস্তার মোড়ে একটি মূর্তি বসানর কাজ চলছে। সূত্রধার মঞ্চে আসে।)

সূত্রধার : নমস্কার, আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন—বর্ণ. ভাষা, ধর্ম উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আর যাঁরা আমার স্বদেশবাসী, তাঁদের জানাই আমার গভীরতম প্রীতি ; কারণ, আমরা সকলে এক মহান দেশের সন্তান। ভাবতেও গৌরবে বুক ভরে ওঠে যে, আমরা সেই দেশে বাস করি, যার উত্তরে গিরিরাজ ঝক্ ঝকে সাদা বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিমালয় —যেন এক মৌন মহাপুরুষ নীরব ভাষায় আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে—"হে মানুষেরা ! দর্প কোর না, বিনয়ী হও ! মনে রেখ—প্রকৃতি বিরাট আর গম্ভীর !"

আমরাও সুপ্রাচীন কাল থেকে সেই শিক্ষা মাথায় তুলে নিয়ে অনন্ত ব্যাপ্ত এই বিশ্বপ্রকৃতির কাছে নতি স্বীকার করেছি।

এদেশের দক্ষিণে মহাসমুদ্র অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে আছড়ে পড়ে বলছে—"হে মানুষ, ভয় পেও না ! তোমার এই দেহের মৃত্যুই শেষ কথা নয় ; একটি ঢেউ যেমন আমার বুক থেকে উঠে কিছুক্ষণ নৃত্য করে আবার আমার বুকেই

মিলিয়ে যায়, তুমিও তেমনি অনন্ত জীবনের একটি ঢেউ মাত্র। খেলা শেষে আবার সেই অনন্ত জীবনে ফিরে যাবে— হারিয়ে যাবে না।

পূব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত আমাদের সমতটে প্রবাহিত সপ্ত নদী যেন এক উদার বক্ষপটে অনন্ত করুণার ধারা; সকলকে উদার আহ্বান জানাচ্ছে—"এস, পান কর অমৃত রসধারা, নিজেকে তৃপ্ত কর, শীতল কর!" সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কত মানুষ এসেছে—[মূর্তি বসানর কাজ লক্ষ্য করে] ওকি, কি হচ্ছে ওখানে? কিছু একটা সাজ গোজ হচ্ছে দেখছি। যাকগে, যা বলছিলাম—সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কত ধরণের মানুষ যে এই দেশে এসেছে তার সীমা সংখ্যা করাও অসম্ভব। এসেছে—সকলেই আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

(নুরুল প্রবেশ করে)

নুরুল : কি রে রামু হোল?

রামু : [নেপথ্যে] এই হল আর কি!

সূত্রধার : যা বলছিলাম—সেই মহান দেশের মহান ঐতিহ্য আমাদের সকলের মনে সকলের শরীরে—

নুরুল : আরে নীচে পায়ের কাছে নেমেছিস কেন? এই!

রামু : [নেপথ্যে] আসছিরে বাবা আসছি।

সূত্রধার : কি ভাই, কি হচ্ছে এখানে?

নুরুল : আঃ! ওঃ, কাল সকালে ফিতে কাটা হবে।

সূত্রধার : ফিতে কাটা?

নুরুল : হ্যা, ঐ মূর্তিটা কাল ওপেন হবে তো—তাই ডেকরেট্ করা হচ্ছে।

(রামুর প্রবেশ)

নুরুল : কি করছিলি নীচে নেমে এতক্ষণ?

রামু : একটু প্রণাম করে এলাম মাইরী, পর্দাটা টাঙ্গাতে গিয়ে গায়ে পা লেগে গেল তো।

নুরুল : সে কি রে।

রামু : হ্যাঁ মাইরী—যদি পাপ-টাপ হয়—খুব ভয় করছিল আমার। আচ্ছা, এ কোন ঠাকুর রে?

নুরুল : ঠাকুর! [হেসে ওঠে] ঠাকুর কি রে!

সূত্রধার : এই যে ও ভাই, এখানে কার মূর্তি বসছে বলুন তো!

নুরুল : সূর্যসেন।

সূত্রধার : সূর্যসেন! (চিন্তিত)

রামু : কি বল্লে, সূর্যদেব? (প্রণাম করে)

নুরুল : ভুর বোকা, এ'ত মানুষ!

রামু : সাহেব?

নুরুল : ধোৎ, দেখলিনা ধুতি চাদর পরা! সাহেবরা কি ধুতি চাদর পরে?

রামু : তাইতো, ধুতি চাদর তো পরান আছে—

সূত্রধার : মাষ্টারদা মূর্তি হয়ে গেলেন! শুনুন, কি বল্লেন আপনি, এটা মাষ্টারদা সূর্যসেনের মূর্তি?

নুরুল : হ্যাঁ হ্যাঁ; সূর্যসেনের, চাটগাঁর সূর্যসেনের।

রামু : কোথাকার রাজা ছিল গো?

নুরুল : ভুর বোকা, রাজা নয়, নেতা। চ' চ' আর ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ না করে চ' ওদের ডেকে আনি। —রাতের মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেলতে হবে, ভোর বেলাতেই তো—

রামু : রাজা নয়—নেতা?

সূত্রধার : না ভাই, তুমি ঠিক বলেছ—মাষ্টারদা রাজাই ছিলেন, সারা চাটগাঁবাসীর মনের রাজা, নইলে তখনকার পররাজ্য-গ্রাসী রাজাই বা তাঁকে এত ভয় পাবে কেন?

রামু : তার মানে?

নুরুল ঃ আরে চ' চ'! —দেখুন, আমরা যাই; কাল সকাল আটটায় মূর্তি ওপেন হবে, আমাদের অনেক কাজ; লোকজন নিয়ে এসে ষ্টেজ্ বাঁধতে হবে। অনেক ঝামেলা —সাহেবরা তো বক্তৃতা দিয়েই খালাস!

রামু ঃ ঐ তো ওরা এসে গিয়েছে।

(কালু, নিমাই, বঙ্কা, বৃদ্ধ প্রভৃতি কাজের জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করে)

নুরুল ঃ এই, মালপত্র সব কোথায় রেখে এলি?

কালু ঃ আসছে, আসছে, একটু পিছিয়ে পড়েছে।

রামু ঃ আচ্ছা, কোন রাজা এঁকে ভয় করত—বলছিলেন?

নুরুল ঃ এত আচ্ছা বোকা! আরে গাধা জানিস না উনি তো ইংরেজদের তাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন।

রামু ঃ কেন?

কালু ঃ কে, কে?

নুরুল ঃ আরে,—ঐ যে টেররিষ্টরা ইংরেজদের তাড়াতে চেষ্টা করেছিল না?

কালু ঃ চেষ্টা করেছিল! কি বলছ নুরুভাই,—ওরাই তো ইংরেজদের তাড়িয়েছিল।

নিমাই ঃ না-না তা-বল্লে কেন হবে—ওদের তো মেরেই লোপাট করে দিয়েছিল বৃটিশ। আসলে মহাত্মা গান্ধীই দেশ স্বাধীন করেছেন।

নুরুল ঃ এই বাদ দে ও সব বক্‌বাস, তাড়াতাড়ি কাজে লাগ! ভোরের মধ্যেই সব শেষ করতে হবে। আটটার মধ্যে সাহেবরা এসে পড়বে।

রামু ঃ আচ্ছা নুরু ভাই, ইংরেজ মানেও তো সাহেব—তাই না?

নুরুল ঃ হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে তোমার ঐ সব কেলে সাহেব না।

রামু ঃ সে জানি, খুব ফর্সা দেখতে। আমি না একদিন ক'জন মেম্ ও দেখেছি; কি ফর্সা আর গট্‌মট্ করে ইংরাজী

বলছে। আচ্ছা ওরা এত ফর্সা তবু ওদের তাড়ান হল কেন ?

নুরুল : অ্যঃ! [ঢোক গিলে] মানে—ওরা'ত আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল—মানে আমাদের দেশ শাসন করত।

রামু : তাতে কি ?

নিমাই : দুর বোকা, কেন ওরা সাত সমুদ্দুর পার হয়ে এসে আমাদের দেশ শাসন করবে ?

রামু : তাতে দোষ কি—যদি ওরা ভাল শাসন করতে পারে—

বৃদ্ধ : ভাল মানে, বৃটিশের থেকে ভাল শাসন কেউ করেছে নাকি কোন দিন !

নিমাই : আরে ধ্যুর, ওরা না আলাদা জাত, দেখিসনি ওদের গায়ের রঙ সাদা আর আমরা কাল।

রামু : ধ্যুস্—আমাদের সবাই কাল নাকি, কত ফর্সা লোক আছে আমাদের দেশে !

কালু : ঠিক কথা,—আমাদের মহাদেবেরই তো গাঁয়ের রঙ ফর্সা ধবধবে।

বৃদ্ধ : হ্যাঁ—হ্যাঁ মাথার জটার রঙও বাদামী।

রামু : তবে তবে।

বঙ্কা : ঠিক ঠিক [সুর করে] ভোলা বাবা পার করেগা, ত্রিশুলধারী পার করে গা !

(কয়েকজন ধ্বনি দিয়ে হৈ চৈ করে ওঠে)

বৃদ্ধ : অঃ—এই থাম না ! যাই বল বাপু ইংরেজ আমলে আমরা ভালই ছিলাম, —জিনিসপত্রের এত দাম ছিল না . আর—

নুরুল : তাই বলে আমরা চিরদিন পরাধীন থাকব, তুমি বলছ কি বুড়ো ?

বৃদ্ধ : আরে থ্যু থ্যু—এই তোদের স্বাধীনতা ; চাকরী নেই-বাকরি নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আজ লোড সেডিং,

কাল গাড়ী চলে না—

নুরুল : আরে ধ্যুর ; অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সে জন্য কি স্বাধীনতা দায়ী ?

সূত্রধার : না স্বাধীনতা কিছুতেই দায়ী হতে পারে না। কিন্তু এরা যা বলছে তার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। তুমি ঠিকই বলেছো রামু! যার যে যোগ্যতা, তাকে সেই মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করা উচিত নয়, —তা সে সাদাই হোক আর কালই হোক। দেখনা আমরা কত রঙের দেবতার পূজা করি ; দেবাদিদেব মহাদেব ধবধবে সাদা, আবার জগতের নাথ জগন্নাথ মিশমিশে কাল। মা দুর্গা সোনার বরণ অথচ মা কালীর গায়ের রঙ মেঘের মত কাল। সুতরাং গায়ের রঙের জন্য নয়, অন্য কারণ ছিল ইংরেজ তাড়ানর এই আন্দোলনের পিছনে। সেই কারণকে বুঝতে হলে তোমাকে তাকাতে হবে ভারতের ইতিহাসের দিকে। দেখ, এদেশে কত জাত এসেছে—শক, তুর্কী, মোঘল, পার্শী, ইহুদী—তাঁদের সকলকেই আমরা আপন করে নিয়েছি। তাঁরা ভারতে এসেছে, ভারতের অঙ্গ হয়ে থেকেছে ; ভারতের স্বরাটত্বকে ধ্বংস করে তাদের পদানত করতে চেষ্টা করেনি। একমাত্র বৃটিশই ভারতের আত্মাকে ধূলি লুণ্ঠিত করেছে, ভারতকে লুণ্ঠন করে তাদের নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অতীতেও এই রকম ব্যবহারের উত্তরে গর্জে উঠেছে ভারত।

তাকাও ইতিহাসের দিকে। গ্রীক পদানত ভারতকে মুক্ত করতে জেগে উঠল ভারত আত্মা, ব্রাহ্মণ চাণক্যের রূপ ধরে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করল, গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়ে এল কান্দাহারের মাঠ পেরিয়ে। আরও কত লুঠেরা এল, তাড়া খেয়ে পালাল, ইতিহাসের পাতা তার সাক্ষী।

কিন্তু তুর্কী বা মোঘল যখনই তাঁদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, অপমানিত করতে চেষ্টা করেছে ভারতের মহান গাম্ভীর্যকে জেগে উঠেছে চৈতন্য, কবির, নানক, রামদাস, চিনিয়ে দিয়েছে ভারত-অমৃত-রসধারা। এল ইংরেজ। সেটা একনায়কতন্ত্রের অন্তিম যুগ। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফলেই সিরাজকে অপসারণের ষড়যন্ত্রে ভারতেরই কেউ কেউ সাদরে বন্ধু বলে গ্রহণ করল ইংরেজদের। তারা বুঝতে পারেনি বণিকেরাও পররাজ্য লোভী হয়। কিন্তু বুঝতে বেশী বিলম্ব হল না, ধূমায়িত হল সিপাহী বিদ্রোহ। সেই জাতীয় বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মহান ভারত এই দুঃস্বপ্নের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল।

সকলে ঃ তারপর, তারপর ?

রামু ঃ তারপর কি হল ?

সূত্রধার ঃ কিন্তু বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী রাজা রাজড়াদের অকর্মন্যতা আর লোভ সে বিদ্রোহকে পরাজয়ে পর্যবসিত করল।

রামু ঃ ওঃ।

কালু ঃ
নিমাই ঃ } তারপর, তারপর ?

সূত্রধার ঃ সে বিদ্রোহ পরাজিত হলেও আরও অসংখ্য ধারাবাহিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছে লুঠেরাদের। অপর পক্ষে সভ্যতার গর্বে গর্বিত ইংরেজ লুব্ধ শার্দুলের মত চালিয়েছে নির্বিচার শোষণ আর অত্যাচার।

বঙ্কা ঃ তারপর ?

সূত্রধার ঃ ভারত বুঝল, আর নয়, মারের বদলে মারই দিতে হবে।

রামু ঃ কিন্তু, এইসব মারামারি কাটাকাটি কি ভাল ?

সূত্রধার : এঁ্যা ?

রামু : বলছি যে, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি করা কি ভাল —মানে সবাইতো মানুষ ?

সূত্রধার : তোমার প্রশ্নটি খুব জটিল রামু। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তোমাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো ইতিহাস জানতে হবে। সে বিশাল ইতিহাস তোমাকে কেমন করে বলি .....আচ্ছা, ধর চাটগাঁর কথা : আজ থেকেপ্রায় অর্ধশতাব্দি আগে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবশিষ্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে এলেন চাটগাঁয়ে কংগ্রেসের সংগঠন করতে। যতীন্দ্রমোহন চাটগাঁয়েরই ছেলে। চাটগাঁর স্বনামধন্য জমিদার ও আইনজীবী যাত্রামোহন সেনগুপ্তের তৃতীয় পুত্র।

(পট পরিবর্তন)

প্রথম অঙ্ক

(যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ। যতীন্দ্রমোহন বক্তৃতা করছেন, সামনে জনতা বক্তৃতা শুনছে, তারমধ্যে সাম্যাশ্রমের বিপ্লবীরাও আছেন)

যতীন্দ্র ঃ তিনি বলেছেন : "তোমরা আমাকে এককোটি টাকা আর এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক দাও, আমি তোমাদের এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেব।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "আমাদের স্বরাজ আসবে অহিংস-অসহযোগের পথে।" —তাই আজ আমাদের এমন এক কোটি স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন, যাঁরা সম্পূর্ণ অসহযোগে ব্রতী; যে কোন অত্যাচার সহ্য করে মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করে চলবেন। আপনারা আজ বিভক্ত, খণ্ড ক্ষুদ্র হয়ে আছেন ; আসুন, আমরা কংগ্রেসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাই। তাঁর এই ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাস নিজের সমস্ত সম্পদ ও জীবন এই ব্রতে দান করেছেন। আপনারাও এগিয়ে আসুন—এই আমার একান্ত আবেদন। বন্দে মাতরম্।

(জনতা প্রতিধ্বনি করে, হাততালি দেয়)

মহিম ঃ (এগিয়ে এসে) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের ভাষণ আপনারা শুনলেন। আজ ভারতবাসীর সম্মুখে এই বিপুল দায় এসে পড়েছে। আজ আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে

হবে, শক্ত করতে হবে মহাত্মা গান্ধীর হাত। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ঃ আজ থেকে অসহযোগই আমার জীবনের ব্রত হল, মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথেই আমার জীবনকে গড়ে তুলব। আর আমি বৃটিশ বিচারালয়ে যাব না, নিজের পেশা ওকালতি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করলাম।

(জনতা ধন্যবাদ, সাধুবাদ জানায়, হাততালি দিয়ে অভিনন্দন করে। ত্রিপুরা চৌধুরী এগিয়ে এসে বক্তৃতা শুরু করেন।)

ত্রিপুরা ঃ আজ মহিমবাবু যে মহত্ব প্রকাশ করলেন তা সত্যই বীরত্বপূর্ণ। আর এ ঘটনা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অদ্ভুত সাফল্যের নজীর। আমরা মহিমবাবুর দেশপ্রেমকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

জনতা ঃ জয়!

ত্রিপুরা ঃ বন্দেমাতরম্!

জনতা ঃ বন্দেমাতরম্!

(সূর্যসেনের সঙ্গে পরামর্শ করে অনুরূপ সেন উঠে দাঁড়ান।)

অনুরূপ ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে, বলব?

ত্রিপুরা ঃ অ্যাঁ, কি কথা?

যতীন্দ্র ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ বলুন-বলুন।

অনুরূপ ঃ যদি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখাটা একটু বুঝিয়ে বলেন—মানে কিভাবে এই আন্দোলন পরিচালিত হবে—এই সব।

যতীন্দ্র ঃ [মহিম, ত্রিপুরাকে] আমি বলি?

ত্রিপুরা ঃ অবশ্য-অবশ্যই।

যতীন্দ্র ঃ আমরা স্বরাজ দাবী করব, ন্যায়ের শাসন চাইব; যদি ওরা না দেয়, ওদের সাথে আমরা সহযোগিতা করব না। অবশ্যই এটা আমরা করব অহিংস ভাবে। মানুষে মানুষে মারামারি হানা হানি কোন দিনই কোন মঙ্গল আনতে

পারেনি, আর পারবেও না। তা ছাড়া, এটা আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্যও নয়।

নির্মল : আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

যতীন্দ্র : বলুন !

নির্মল : যখন ওরা আমাদের মারবে, অত্যাচার চালাবে তখন আমরা কি করব ?

যতীন্দ্র : তখনও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। মারুক ওরা যত খুশী, কিন্তু আমরা কিছুতেই হিংসার পথ ধরব না। মার খেয়ে খেয়েই আমরা ওদের হারিয়ে দেব। মহাত্মাজী বলেছেন—"বৃটিশের শক্তি আজ প্রচণ্ড, বিশাল তার অস্ত্রবল। তাদের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমরা পারব না বলেই আমাদের এই অহিংস পথ।" তিনি আরও বলেছেন—"অহিংসা হচ্ছে শক্তিশালীর হাতিয়ার, আর দুর্বলের হাতিয়ার হচ্ছে অস্ত্র।" তাঁর এই কথা যে কত সত্য তা আপনারা বুলক ব্রাদার্সের ধর্মঘটে দেখেছেন। আপনারা দেখেছেন, শান্তিপূর্ণ হরতালের শক্তি কি ভাবে বৃদ্ধি পায় : বিনা সংবাদে, বিনা আহ্বানে, বিনা সংগঠনে কত উৎসাহের সঙ্গে লঙ্কা জাহাজের নাবিকেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল—

অনন্ত : [নিচু গলায়] সে কি মাষ্টারদা, আমরা তো আগের দিন রাত্রে জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এলাম !

(মাস্টারদা চুপ করতে ইঙ্গিত করেন।)

যতীন্দ্র : কি হয়েছে ?

মাষ্টারদা : কিছু না, আপনি বলুন !

যতীন্দ্র : হ্যাঁ, যা বলছিলাম—লঙ্কা জাহাজের নাবিকদের ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারছেন—কি বিপুল, কি দুর্বার শক্তি এই অসহযোগের।

অনুরূপ : কিন্তু ক্রমাগত মার খেতে খেতে আমাদের মনোবল কি

ভেঙ্গে পড়বে না ?

(ইউরোপীয় পোষাক পরিহিতা নেলী সেনগুপ্তার প্রবেশ।)

নেলী : মাফ কর আমাকে—এই একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

(যতীন্দ্রমোহন টেলিগ্রাম হাতে নেয়, কিন্তু পড়তে ভুলে যায়। নেলী অপেক্ষা করতে থাকে)

যতীন্দ্র : না, ক্রমাগত মার খাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আমরা যদি তাঁকে এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক আর এক কোটি টাকা দিতে পারি, তিনি এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ এনে দেবেন।

অনুরূপ : সেটা অবশ্য আলাদা কথা—

মহিম : না, সেটাই কথা। আর এক বৎসর মাত্র আমাদের দুঃখের কাল আছে, তারপরেই স্বরাজ।

(বিনয় সেন, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, সুখেন্দু সেনগুপ্ত, প্রেমানন্দ, সিরাজুল দ্রুত প্রবেশ করে)

বিনয় : দাদা, একটা দুঃসংবাদ আছে, ভীষণ দুঃসংবাদ!

জনতা : কি, কি হয়েছে।

প্রেমানন্দ : এতবড় পৈশাচিক অত্যাচারের কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে।

সকলে : কি, কি হয়েছে ?

বিনয় : চাঁদপুর রেলষ্টেশনে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

নেলী : সম্ভবতঃ এই সংবাদটাই আছে ঐ টেলিগ্রামে।

(যতীন্দ্র টেলিগ্রামটি পড়ে।)

যতীন্দ্র : হ্যাঁ, হ্যাঁ এই খবরই—ওখানকার কংগ্রেস নেতা হরদয়াল নাগ টেলিগ্রাম করেছেন—আমাকে যেতে লিখেছেন। শুনুন, আপনারা উত্তেজিত হবেন না, আমি এখনি সেখানে যাচ্ছি। [নেলীকে] শোন, চল, আমাকে এখনই বেরুতে হবে। মহিমবাবু, ত্রিপুরাদা আপনারা এদিকটা দেখবেন!

চলি।

(নেলী ও যতীন্দ্রের প্রস্থান)

প্রেমানন্দ : ওঃ, কি ভীষণ পৈশাচিক ব্যাপার !

মাষ্টারদা : শুনুন, আমরা একটু ভাল করে সব কিছু জানতে চাই, আপনারা সমস্ত ঘটনাটা একটু খুলে বলুন !

জনতা : হ্যাঁ, হ্যাঁ সমস্ত খুলে বলুন !

গিরিজা : বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে কি ভাবে দালালেরা নতুন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখিয়ে চা বাগানের জন্য কুলি জোগাড় করে। এরা বেশীর ভাগ আসে রাঁচী, ছাপরা, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলা থেকে। কিন্তু বাগানে আসার পর অন্য চিত্র ; ঋণের বোঝায় পিষ্ট এক অসহ্য জীবন। চলে ধারাবাহিক নিপীড়ন ও শোষণ। তাই আজ তারা মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বেরিয়ে এসেছে ; আর চা বাগানে কাজ করবে না, তাদের স্বদেশে ফিরে যাবে।

সকলে : নিশ্চয় যাবে, ইচ্ছে না থাকলেও কাজ করতে হবে নাকি ?

বিনয় : কিন্তু মালিকরা তাদের ছাড়বে না, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতেই হবে।

সুখেন্দু : কিন্তু চা-শ্রমিকরা আর সেই বাঁধন মানতে রাজী নয় —তারা মহাত্মা গান্ধীর ডাক শুনেছে—বেরিয়ে পড়ল দলে দলে। এদিকে বৃটিশ কোম্পানীগুলো করিমগঞ্জের ষ্টেশন মাষ্টারকে বাধ্য করল কুলিদের রেলের টিকিট না দিতে।

সকলে : তারপর ?

প্রেমানন্দ : না, তাতে তাদের গতি রোধ করা যায়নি ; সেই হাজার হাজার নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ সুদূর আসাম থেকে পায়ে হেঁটে চাঁদপুরে চলে আসে।

অনুরূপ : সাবাশ, সাবাশ চা বাগানের শ্রমিক - সাবাশ ! ইনক্লাব

সকলে ঃ জিন্দাবাদ !

অনুরূপ ঃ বন্দে মাতরম্ !

সকলে ঃ বন্দে মাতরম্ !

বিনয় ঃ কিন্তু চাঁদপুরের এস, ডি, ও এবং জেলা কমিশনার তাদের পথ রুদ্ধ করে দিল ; তাদের জাহাজে উঠতে দিল না। সমস্ত দিন অপেক্ষা করে জাহাজে উঠতে না পেরে কুলিরা রেল ষ্টেশন চত্বরে আশ্রয় নিল।

সকলে ঃ তারপর ?

বিনয় ঃ তারপর গভীর রাত্রিতে ষ্টেশনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে—ওঃ !

মাষ্টারদা ঃ কি হল, বলুন, থেমে যাবেন না।

বিনয় ঃ বলতে পারছি না, আমি বলতে পারছি না।

সিরাজুল ঃ শুনুন নিদ্রিত অসহায় শিশু-বৃদ্ধ নারীসহ সমস্ত কুলিদের উপর গুর্খা সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে এক পৈশাচিক ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছে বৃটিশ সরকার।

বিনয় ঃ শুধু তাই নয়, তারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড গোপন করবার জন্য মৃত ও আহত দেহগুলোকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে মেঘনার জলে।

মাষ্টারদা, অনুরূপ } এর বদলা চাই, এর বদলা নিতেই হবে।—

মহিম, ত্রিপুরা } এর জবাব দিতেই হবে।

সকলে ঃ বদলা চাই—বদলা চাই !

সুখেন্দু ঃ শুনুন-শুনুন, কুলিদের উপর এই নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে চাঁদপুরের ষ্টেশন মাষ্টার গুর্খা সৈন্যদের হাতে আহত হয়েছেন। তাছাড়া এই

অত্যাচার সাধারণ রেলশ্রমিকদেরও প্রচণ্ড মর্মাহত করেছে। সুতরাং রেল শ্রমিকদের দিয়ে একটা ধর্মঘট করাতে পারলে—

অনুরূপ : ঠিক, রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট করাতে পারলে খুব ভাল হবে।

মাষ্টারদা : শুধু রেল শ্রমিক নয়, আমাদের চেষ্টা করতে হবে। রেল ও জাহাজের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সব কিছু বানচাল করে দিতে হবে। মোট কথা—এর বদলা নিতেই হবে।

মহিম : ঠিক একটা কিছু করতেই হবে।

ত্রিপুরা : হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, জেলা কংগ্রেস অফিসে গিয়ে একটা বন্দোবস্ত করা যাক।

(সকলে প্রস্থানোদ্যত)

বিনয় : চা-শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের জবাব চাই!

নির্মল : জবাব নয়, বদলা চাই।

সকলে : বদলা চাই—বদলা চাই।

অনুরূপ : ইনকিলাব!

সকলে : জিন্দাবাদ!

(সাম্যাশ্রমের সভ্যরা ছাড়া ধ্বনি দিতে দিতে সকলে বেরিয়ে যায়)

অনুরূপ : এদিকে সবাই আসুন। অনন্ত, গণেশ এস, দ্রুত এই নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মসূচী স্থির করে ফেলতে হবে! সূর্যবাবু আপনি বলুন!

মাষ্টারদা : আমরা অবশ্যই এই আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করব।

চারুদত্ত : নিশ্চয়—এতে আমাদের মনেপ্রাণে যোগ দেওয়া উচিত।

অনুরূপ : সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের সাম্যাশ্রমের তো একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকা দরকার।

চারুদত্ত : এখন আর সাম্যাশ্রমের আলাদা কর্মসূচী কি, কংগ্রেস যা কর্মসূচী নেবে তাই এখন কাজ।

মাষ্টারদা : না, এই ধর্মঘটে আমরা আপ্রাণ সহযোগিতা করলেও, আমাদের কাজ আমাদের নিজস্ব কর্মসূচী ও পদ্ধতি অনুযায়ী হবে। প্রচার, প্রসার ও অন্যান্য সমস্ত কাজে আমরা ওদের সাহায্য করব। কিন্তু কংগ্রেসীদের মত সাম্যাশ্রমের কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করবে না। আপনারা কি বলেন ?

অনুরূপ
নগেন } ঠিক-ঠিক, —ও সব অসহযোগ-টোগ আমরা বুঝিনা।

অম্বিকা : ওতে কেবল আমাদের শক্তির অপচয় করা হবে।

মাষ্টারদা : বৃটিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সহযোগেরও নয়, অসহযোগেরও নয়—প্রতিযোগের। ওরা আমাদের শোষণ করছে, আমরা ওদের তাড়াব ; ওরা আমাদের মারছে, আমরা ওদের মারব ; ওরা আমাদের পদানত করে রেখেছে, আমরা স্বাধীন হব। আর তারপর যদি কোন দিন ওরা ওদের দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়, আমরাও সেদিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করব।

অনুরূপ : ঠিক-ঠিক, এই আমাদের পথ। এখন আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আগামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ—

সকলে : জিন্দাবাদ !

দৃশ্যান্তর

সূত্রধার : সত্যি চা বাগানের শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের ফলে ক্ষুব্ধ-রেলশ্রমিক ও জাহাজের নাবিকেরা ধর্মঘট করে বসল। চলল—ধর্মঘট তিনমাস ধরে। দেখুন, মান-

অভিমানের একটা প্রকৃতি হচ্ছে, এটা যার উপর করা হয় তার উপরই এটা নির্ভরশীল। যেমন ধরুন, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে মান করল যে, সে আর হাড়ি ছোবে না; তখন তার স্বামী যদি এসে তোয়াজ-তোষামোদ করে বলে—"বৌ ওঠো, হেঁসেলে যাও!" তবে বৌয়ের মান থাকে। কিন্তু স্বামী যদি "ধুত্তরী" বলে হোটেলে খেয়ে অফিস চলে যায়,—তখন বৌয়ের মান থাকে কোথায়? সত্যি বলতে—ধর্মঘট ব্যাপারটা একরকম মান অভিমান ছাড়া আর কি বলুন? কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তো আর ভাল মানুষ বরটি নয়, তাই তাঁরা বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানি ক'রে রেলও চালালেন, ধর্মঘটীদের নানা ভীতি, প্রলোভন প্রদর্শন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি নির্যাতনও চালালেন।

[যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ীর ভিতরের ঘর]

যতীন্দ্র : [হাতে একখানি নিষেধাজ্ঞার কাগজ] আবার এক'শ চুয়াল্লিশ ধারা! জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মশাই, গত তিন-চার মাস যাবৎ আমি যত বক্তৃতা দিয়েছি, তাতে সব সময় জনগণকে অহিংস থাকার পরামর্শ দিয়েছি—কখনও আইন-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার উত্তেজনা দিই'নি। চট্টগ্রামবাসীরা আমাকে ভালবাসেন, তাই তাঁরাও কোন রকম হাঙ্গামা করেননি। অথচ এই কারণেই বার বার আমার প্রতি এক'শ চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হচ্ছে—এ ভারী অন্যায়! যা হোক—আমি আপাততঃ এ নির্দেশ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস যদি আমাকে এ নির্দেশ অমান্য করতে বলে—তৎক্ষণাৎ একে অমান্য করব।

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রাম মোসলেম হল প্রাঙ্গণে জনসভা। নেপথ্যে ঘোষণা শোনা যায়—"বন্ধুগণ, এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন চট্টগ্রামের মুকুটহীন রাজা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা।" নেলী বক্তৃতা করতে এগিয়ে আসেন, জনতার হাততালি শোনা যায়।]

নেলী ঃ ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আপনারা যাঁদের বক্তৃতা শোনবার আশায় এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা এখানে আসতে পারেননি। দুই মাসের উপর আপনাদের ধর্মঘট চলছে। তা ছাড়াও বহুবিধ অত্যাচার ও নিপীড়ন আপনাদের সহ্য করতে হচ্ছে। এই দুঃসময়ে যাঁদের দেখে, যাঁদের কথা শুনে আপনারা মনে বল ভরসা পাবেন, তাঁদের এই সভায় আসতে দেওয়া হয়নি, এক'শ চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে তাঁদের গতি রুদ্ধ করা হয়েছে। সরকারী অভিযোগ এই যে, পাহাড়তলীর হাঙ্গামায় আমার স্বামী যতীন্দ্রমোহনের প্ররোচনা ছিল। এ' একেবারে ভিত্তিহীন অভিযোগ। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন যে, আমার স্বামী কখনও দাঙ্গা হাঙ্গামাকে সমর্থন করেন না, পাহাড়তলীর ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তবু এই সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। আজ গভীর বেদনার সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের আমার স্বদেশবাসী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করি। আমার জন্মভূমি ইংলণ্ডের অধিবাসীরা সত্যবাদী ও সৎ প্রকৃতির—এত ক্ষুদ্র, এত

নীচ নয়। এদেশে শ্বেতাঙ্গরা যেরকম দুর্ব্যবহার করেন, তা তাঁদের কল্পনারও অতীত। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিরাট আন্দোলন শুরু করেছেন তা অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। তবে সে সাফল্যের জন্য আপনাদের সর্ব্বক্ষণ অহিংস নীতিই মেনে চলতে হবে। আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[বিপুল হর্ষধ্বনি]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ শ্রীমতি সেনগুপ্তা ঠিকই বলেছেন—কিট্‌স্‌, সেক্সপীয়র, নিউটনের জাতি নিশ্চয় সত্যবাদী, নিশ্চয় মহান। কিন্তু বৃটিশজাতি আর বৃটিশ রাজশক্তি তো এক নয়; বিশেষতঃ —যখন তাদের ভারত শাসনের আসল উদ্দেশ্য ভারত শোষণ। যাই হোক, সেদিন মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল ভারতীয় জনসাধারণ।

[রহমতগঞ্জের পাহাড়ে নির্জন জায়গায় বসে সাম্যাশ্রমের সদস্যদের আলোচনা সভা।]

চারুদত্ত ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সাড়া দিয়েছে—মহাত্মার এ আন্দোলনে গোটা দেশ সানন্দে সাড়া দিয়েছে। এ কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

অম্বিকা ঃ আমরা তা অস্বীকার করছি না।

চারুদত্ত ঃ তবে? এখন আর কোন দ্বিধা রাখা উচিৎ নয়—আমাদেরও মনে প্রাণে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

অম্বিকা ঃ আমরা তো সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনকে সাহায্য করছি ; ধর্মঘটের বেশীর ভাগ কাজই করছে এই সাম্যাশ্রমের কর্মীরা—তা আপনি ভালভাবেই জানেন।

চারুদত্ত ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, কিছু কিছু চাঁদা তুলে দিয়েছি আমরা।

নগেন ঃ না, শুধু চাঁদা তোলা তো নয়—ধর্মঘটের পক্ষে সব রকম প্রচার করেছি আমরা। এ ছাড়া, চাঁদপুর থেকে চাঁটগা—নব্বুই মাইল পথ শুধু মাত্র সাইকেলের সাহায্যে অতিক্রম ক'রে ডাক যোগাযোগ রক্ষা কর খুব সহজ কাজ নয়। দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ একাজ করে আমাদের সাম্যাশ্রমের সভ্যরা সত্যকারের বিপ্লবী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে।

চারুদত্ত ঃ এসব করলেও আমরা নিজেদের আলাদা করে রাখছি —ফলে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। যখন অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী হাসিমুখে কারাবরণ করছে, আমরা পুলিশের হাত এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

মাষ্টারদা ঃ এ ব্যাপারে আমাকে দু' একটা কথা বলতেই হচ্ছে— [দ্রুত অনন্ত সিং প্রবেশ করে। সে এসে বিপ্লবী কায়দায় অভিনন্দন করে দাঁড়ায়।] এস অনন্ত, এদিকে এস, আজকের রিপোর্টিং কর !

অনন্ত ঃ মাষ্টারদা, আমাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু রেল শ্রমিকদের মনোবল আর ধরে রাখা যাচ্ছে না, তারা আরও বেশী সংখ্যায় কাজে যোগ দিয়েছে। গতকাল জে. এম. সেনগুপ্ত, মহিমবাবু, ত্রিপুরাবাবুদের গ্রেপ্তারের পর তারা আরও হতাশ হয়ে পড়েছে।

মাষ্টারদা ঃ ঠিক আছে—এটা আমরা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম।

অনন্ত : মাষ্টারদা··· [ইতস্ততঃ করতে থাকে।]

মাষ্টারদা : কিছু বলবে ? [অনন্ত চুপ করে থাকে] তোমার যা বলবার আছে বল অনন্ত, বিপ্লবীদের মধ্যে মনোভাব গোপন করা অন্যায়, তা তুমি জান ; সুতরাং বল !

অনন্ত : মাষ্টারদা, আপনি আমাদের পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলতে বলছেন—আমরা তাই করছি। এদিকে কংগ্রেসীরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করছে। এর ফলে সমস্ত শহরে আমাদের খুব নিন্দা হচ্ছে। সকলেই আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছে : কি অনন্ত, কোথায় গেল তোমার বীরত্ব, তুমি দেখি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ ? এমন কি আমার বাবা—যিনি সমস্ত রকম বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অপছন্দ করেন, তিনিও বলেছেন—'অনন্ত তো গ্রেপ্তার হলেই পারে,—এক মাসের বেশী তো রাখে না।' সকলের এই অপমান আর সহ্য হচ্ছে না মাষ্টারদা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে—

মাষ্টারদা : অনন্ত, তোমার বীরত্বের প্রদর্শনী করা এই বিপ্লবী সাম্যাশ্রমের উদ্দেশ্য নয়। সাম্যাশ্রমের উদ্দেশ্য : ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর মুক্তি। সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রয়োজন মত তোমাকে বীরপুরুষ কাপুরুষ সবই হতে হবে।

চারুদত্ত : দেখলেন তো— [গণেশ দ্রুত আসে, সে হাঁপাচ্ছে।]

অনুরূপ : দাঁড়ান ! [চারুবাবুকে থামতে ইঙ্গিত করেন] এস গণেশ ! কি খবর ?

গণেশ : দাদা. জে. এম. সেনগুপ্ত, মহিমবাবু, ত্রিপুরাবাবুদের কলকাতা নিয়ে যাবে।

সকলে : এঁ্যা !

অম্বিকা : কখন ?

গণেশ : রাতের ট্রেনে। বহুলোক জেলগেটে জড়ো হচ্ছে।

অনন্ত : দাদা, আমরা একটু দেখে আসব ?

অনুরূপ : যাও, তবে খুব সাবধান !

অনন্ত : চল তো ! [গণেশ ও অনন্ত চলে যায়।]

অনুরূপ : এবার আপনি বলুন চারুবাবু।

চারুদত্ত : বলব আবার কি—নিজেরাই তো অনন্তের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলেন যে, আমরা কতখানি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আর কংগ্রেস কতটা জনসমর্থন অর্জন করেছে। [দূর থেকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কি—জয়, মহাত্মা গান্ধী কি—জয়. বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায়।] ঐ শুনছেন, কত লোক যতীন্দ্র মোহনকে দেখতে ছুটছে, বুঝতে পারছেন ?

অম্বিকা : ও কথা থাক, আপনি শুধু আমাদের বর্তমান কর্তব্য কি —সেটাই বলুন।

চারুদত্ত : কেন, আমার বক্তব্য খুব সহজ :—মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, এখন আর সাম্যাশ্রমের আলাদা অস্তিত্ব নিরর্থক।

মাষ্টারদা : না, সাম্যাশ্রমের অস্তিত্ব নিরর্থক নয়। শুধুমাত্র অহিংস অসহযোগের দ্বারা জাতি স্বাধীন হতে পারে—আমরা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস সম্পর্কে আমাদের নীতি হচ্ছে : কংগ্রেস যে পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে, সেই পরিমাণেই আমরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করব এবং একই সঙ্গে আগামী বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলার কাজ

[নেপথ্যে আর্তনাদ, 'ভাল করে ধর, পড়ে না যায়'—ইত্যাদি আওয়াজ শোনা যায়। নবীন ও আসরাফ একজন বৃদ্ধকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে।]

সকলে : একি, কি ব্যাপার ?

নবীন : দাদা ধরুন,—এঁকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে !

অম্বিকা : কে ইনি ? [বৃদ্ধকে ধরেন]

নবীন : জানি না, নাম বলতে পারছেন না। [বৃদ্ধ ভয়ার্ত ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি যন্ত্রণায় কাঁপছে ।] আমি আর আসরাফ ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম ; দেখি এই বৃদ্ধ ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের সামনে পড়ে গেলেন, দেখলাম সমস্ত শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, কোন কথাই বলতে পারছেন না—তাই এখানে নিয়ে এলাম।

অনুরূপ : ভালই করেছ—এক্ষুনি ওঁর ফার্ষ্ট এইডের বন্দোবস্ত করতে হবে।

আসরাফ : ষ্টেশনে বোধহয় আরও এই রকম ঘটনা ঘটছে—আমরা যাই ওদের বাঁচাতে হবে। [মাষ্টারদা, মাষ্টারদা বলতে বলতে গণেশ ও অনন্ত দ্রুত আসে ।]

অনন্ত : মাষ্টারদা মাষ্টারদা, ষ্টেশনে ভীষণ কাণ্ড।

অনুরূপ : কি, কি হয়েছে ?

গণেশ : গুর্খা সৈন্যরা শ'শ লোককে মেরে ফেলছে।

মাষ্টারদা : কোথায় ?

অনন্ত : রেল ষ্টেশনের সামনে।

[উত্তেজিত নির্মল সেনের প্রবেশ ।]

মাষ্টারদা : কি হয়েছে নির্মলবাবু ?

নির্মল : যা হয়ে থাকে :—নেতাদের নেতা বানিয়ে সরিয়ে দেওয়া আর জনতাকে রাম পিটানী।

অম্বিকা : ব্যাপারটা কি ?

নির্মল : ব্যাপার আর কি :—যতীন্দ্রমোহনকে দেখতে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত লোকেরা পিছু নিয়েছিল—তাদের ষ্টেশন গেটের মুখে আটকে রেখে নেতাদের গাড়ীতে তোলা হলে গুর্খা

সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতার উপর। অহিংস আন্দোলনের যা পরিণতি তাই হয়েছে।

মাষ্টারদা ঃ চল-চল, সবাই চল, আহত লোকদের যতটা সম্ভব সাহায্য করতে হবে আমাদের। এঁকে নিয়ে চল! অম্বিকাবাবু আপনি এঁকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যান—আমরা ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছি!

[নবীন ও আসরাফ আহত বৃদ্ধকে তুলে নিতে থাকে।]

অনন্ত ঃ [বৃদ্ধের কষ্ট লক্ষ্য করে] মাষ্টারদা, আমরা আর কতদিন এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব?

[মাষ্টারদা চিন্তিতভাবে ঘুরে তাকান।]

অনুরূপ ঃ জিজ্ঞেস কর ঐ চারুবাবুকে!

[সকলে ক্রুদ্ধ ও জিজ্ঞাসুভাবে ঘুরে তাকায়।]

চারুদত্ত ঃ আরে যাও যাও, তোমরা তোমাদের হিংসার পথে গিয়ে মর; আমি আমার পথেই চলব।

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ শুধু চারুবাবু নয়, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেদিন অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল।

[নেপথ্যে দলবদ্ধ গান শোনা যায়]

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

[নেলী সেনগুপ্তাকে নিজের ঘরে দেখা যায়, তাঁর হাতে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ।]

নেলী ঃ একি অন্যায়, আমি তো কোন রকম হাঙ্গামা করিনি, স্বদেশী জিনিষের প্রচার করেছি মাত্র! তবে আমার উপর এই ১৪৪ ধারা কেন ?

আমরা ইংলণ্ডে সব সময় নিজের দেশের জিনিষ ব্যবহার করাকে উৎসাহ দিয়ে থাকি, অথচ ভারতবর্ষে স্বদেশী জিনিষ চালান অপরাধ—কেন ? এ কি বৃটিশ আইন ? আমি জানি সমস্ত সভ্য জগৎ, বিশেষ করে, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ সরকার সর্বদাই স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারে উৎসাহ দেন। এ নিশ্চয় আইন নয়—কিছু লোক বৃটিশ-শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে এসব অত্যাচার করছে।

—দৃশ্যান্তর—

[নেপথ্যে আগের গানটির পরবর্তী অংশ শোনা যায়] ঃ

ঐ মোটা সূতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই ॥

চট্টগ্রামে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্তকে বক্তৃতা করতে দেখা যায়—তাঁর গায়ে খদ্দরের পোষাক, মাথায় গান্ধী টুপি।]

যতীন্দ্র ঃ যদিও গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২১ সালের এপ্রিল মাস থেকেই আমরা, চট্টগ্রামবাসীরা নানা বিপদ ও ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি—তবুও জাতীয়

কংগ্রেস যে সমস্ত কর্মসূচী রেখেছেন তা সফল করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম কমিটি ছত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেছে, শ্রমিক ধর্মঘট ও তিলক স্বরাজ্য তহবিলের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে এবং এই বৎসরের মধ্যে এই জেলাতে আঠার হাজার চরকা ও ষোল হাজার তাঁত চালু করা হয়েছে। এছাড়া পাঁচ হাজার আগে থেকে চালু তাঁতকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

—দৃশ্যান্তর—

[একদল কংগ্রেস সদস্য পূর্ববর্তী গানের শেষাংশ গাইতে গাইতে রাজপথে স্বদেশী বস্ত্র বিক্রি করছে। সাধারণ মানুষ কেউ কেউ সেই গান শুনছে কেউ বা কাপড় কিনছে।]

গানের পরবর্তী অংশ :—

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই—
তবু তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা
কিনে করলি ঘর বোঝাই।
আয়রে, আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই—
পরের জিনিষ কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

[একজন স্বেচ্ছাসেবক দৌড়ে আসে]

স্বেচ্ছাসেবক : বন্ধুগণ, একটা দুঃসংবাদ !

সকলে : কি-কি ব্যাপার ?

স্বেচ্ছাসেবক : সি. আর. দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সকলে ঃ সে কি ?

স্বেচ্ছাসেবক ঃ হ্যাঁ। আর তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং পুত্র চিররঞ্জনও স্বদেশী বস্ত্র ফিরি করার সময় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

১ম বিক্রেতা ঃ বন্ধুগণ, এ অত্যাচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। আমরা আরও বেশী করে স্বদেশী বস্ত্র ফিরি করব, বিক্রি করব এবং পরিধান করব। আমাদের দেশমাতার এই বস্ত্র যদি বিদেশী বস্ত্রের তুলনায় একটু খারাপও হয়, তবু এ আমাদের অমূল্য ধন। আসুন, সকলে এগিয়ে আসুন, বাতিল করুন ম্যাঞ্চেষ্টারের ফাইন ধুতি—মাথায় তুলে নিন মায়ের দেওয়া এই মোটা কাপড়। আসুন, মাতৃ-স্নেহ স্পর্শে নিজেদের ধন্য করি!

[গায়কেরা] —

"ফেলে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গ নারী
কভু হাতে আর প'র না "

ইত্যাদি গান করতে থাকে। দেশবাসীরা এগিয়ে এসে কাপড় কিনতে থাকে। একজন ইউরোপীয় অফিসার কিছু পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করে।]

অফিসার ঃ থাম—চুপ কর! এদের গ্রেপ্তার কর!

[পুলিশেরা লাঠি চালায়। গায়কেরা রক্তাক্ত অবস্থায় গাইতে থাকে—"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে, মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে " ইত্যাদি। ক্রেতারা পালিয়ে যায়। স্বদেশীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। একটি শিশু সেই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতায় কাঁদতে থাকে। মাষ্টারদা এসে শিশুটির হাত ধরেন।]

মাষ্টারদা ঃ কেঁদনা, আমার সঙ্গে এস!

শিশু ঃ ওদের ধরে নিয়ে গেল! [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে]

মাষ্টারদা ঃ জানি।

শিশু ঃ খুব মেরেছে। —কেন ধরে নিয়ে গেল?

মাষ্টারদা ঃ আর বেশী দিন নিতে পারবে না।

শিশু ঃ কেন, মারবে কেন শুধু শুধু?

মাষ্টারদা ঃ না—আর মারতে দেব না। এস, তুমি আমার সঙ্গে এস। [শিশুটি মাষ্টারদার কথায় আশ্বাস পায়—তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

সূত্রধার ঃ অহিংস-অসহযোগে উত্তাল ভারতবর্ষ। কিন্তু কথায় বলে—"রোজ মার খেতে খেতে ঘরের বৌও বেরিয়ে যায় তো—অন্যের আর কথা কি।" ক্রমাগত মার খাওয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদেরও অসহ্য হয়ে উঠল; তাঁরাও অহিংসার পথ ছেড়ে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরাতে একটা কাণ্ড করে বসলেন। অফিসার সমেত মোট একুশ জন পুলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেন তাঁরা। তবে এ ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন; তিনি বলেন ঃ— "চৌরিচৌরার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে. ভারতবাসী এখনও অহিংস আন্দোলনের উপযুক্ত হয়নি। আপাততঃ এই আন্দোলন এখানেই বন্ধ থাক, ভারতবাসী যেদিন এর উপযুক্ত হবে সেদিন আবার এই অহিংস অসহযোগ শুরু হবে।

[চট্টগ্রামের বক্সির হাটে পথ সভার আয়োজন চলছে, লোকজন জড়ো হচ্ছে।]

১ম ঃ হায়-হায়-হায়, ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—এ কি হল!

২য় ঃ সি. আর. দাস জেলে গেলেন, আর আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গেল।

৩য় ঃ রাম-রাম, মহাত্মা এটা কি করলেন; এক চৌরিচৌরাতে একটা ঘটনা ঘটেছে বলে সারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পিছিয়ে যাবে?

১ম ঃ ঠিক কথা! বুঝলাম তারা খুবই অন্যায় করেছে, কিন্তু সারা দেশের আন্দোলন—

৪র্থ : আরে না-না—চৌরিচৌরায় কি খারাপ করেছে ওরা? পুলিশেরা আমাদের রোজ পেটায়—ওরা একদিন তার বদলা নিয়েছে, এতে অন্যায়টা কি হয়েছে?

২য় : [ব্যঙ্গ ভাবে] অন্যায় না হলে কি আর মহাত্মা গান্ধী সমস্ত ভারতবাসীকে অযোগ্য বলে দিতেন!

৫ম : আরে ওরা সবাই ঐ একই রকম। এই দেখনা—যতীন্দ্র-মোহনের দেশ উদ্ধার হয়ে গেল সে ফিরে গেল আবার তার মোটা আয়ের ব্যবসায়।

২য় : কিন্তু রেল ধর্মঘটে যতীন্দ্রমোহন খুব সাহায্য করেছিলেন, বহু টাকা খরচ করেছিলেন।

১ম : ছাই, সমস্ত টাকা সে তিলক-স্বরাজ্য ফাণ্ড থেকে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে—এক পয়সাও ছেড়ে দেয়নি।

সকলে : তাই?

২য় : না-না, মহাত্মা গান্ধীই ঐ টাকা তাঁকে নিতে বলেছিলেন।

১ম : আরে রাখুন—রাজার ছেলে, দু'দিন নেতাগিরীর সখ হয়েছিল—সখ মিটে গেছে, ফিরে গেলেন ঘরে।

৩য় : আরে, ওঁর গুরুতো বলেই দিয়েছেন—ভারতবাসী অযোগ্য—উনি আর এখানে থেকে করবেন কি?

[সকলে হেসে ওঠে।]

১ম : [পকেট থেকে একখানা যতীন্দ্রমোহনের ছবি বের ক'রে] বন্ধুগণ, এই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নির্দেশে আমরা জীবন তুচ্ছ ক'রে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অসহ্য পুলিশী অত্যাচার সহ্য করেছি, আর দেশে বিদেশে তাঁর নাম প্রচারিত হয়েছে—তিনি হয়েছেন দেশপ্রিয়। বন্ধুগণ, আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমরা চট্টগ্রাম থেকে স্বরাজ্য তহবিলের জন্য মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম—তিনি

মাত্র উনত্রিশ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন, বাদবাকী—

সকলে : বাদবাকী ?

৩য় : বাদবাকী তিনি আত্মসাৎ করেছেন।

১ম : বাদবাকী টাকা তিনি রেল ধর্মঘটের খরচ বাবদ নিজে নিয়েছেন।

২য় : না-না, মহাত্মা গান্ধী—

১ম : হ্যাঁ, মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশেই তিনি নিয়েছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। টাকাটা চট্টগ্রামবাসী দিয়েছিলেন ভারত স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে তিলক-স্বরাজ্য তহবিলে। সে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে পূর্বতন কোন ব্যাপারে ঐ টাকা খরচ করবার অধিকার মহাত্মা গান্ধীরও নেই।

৫ম : [লাফিয়ে মঞ্চে উঠে এসে ১ম হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিয়ে] বন্ধুগণ, এই সমস্ত হচ্ছে আমাদের দেশের নেতা! —এদের উপর বিশ্বাস করে আমরা ধনপ্রাণ সমস্ত ঢেলে দিয়েছি, আর এরা নিজের নিজের স্বার্থটি ঠিক তলে তলে গুছিয়ে নিচ্ছে। তাই এই ছবি এতদিন বুকে করে ঘুরেছি আমরা, আজ আর নয়, আর সহ্য করব না।

[ছবি ছিঁড়ে ফেলে।]

সকলে : ঠিক-ঠিক, ছিঁড়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল!

[ছিঁড়ে ফেল পুড়িয়ে ফেল'—ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে সকলে বেরিয়ে যায়।]

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে পাহাড়ের উপরে টুডেল সাহেবের একটি পোড়ো-বাংলোতে সাম্যাশ্রমের সদস্যগণ সমবেত হয়েছে। নগেন সেন দাঁড়িয়ে তাদের পিস্তল

চালান শেখাচ্ছেন। দৃশ্যটি শুরু হতেই নগেন সেনের হাতের পিস্তলটি গর্জে ওঠে।]

নগেন : এরপর এইভাবে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় কার্তুজটি জায়গা মত আনতে হবে, তারপর দ্বিতীয়বার ফায়ার করতে হবে। আজ তোমরা এই পর্যন্ত শিখলে, এর পরদিন তোমরা নিজ হাতে ফায়ার করে লক্ষ্য স্থির করা শিখবে।

নির্মল : এখন তোমরা অস্ত্রগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে থাক, ততক্ষণ মাষ্টারবাবু তোমাদের কিছু বলবেন।

[সকলের হাতে অস্ত্র দেন]

মাষ্টারদা : ভাইসব, বৃটিশ অস্ত্র-শক্তিতে এদেশ দখল করেছে এবং অস্ত্রের জোরেই আমাদের পরাধীন করে রেখেছে—আমাদের ভারত-মাতা আজ শৃঙ্খলিতা। আমাদের সব আছে—আছে জনবল, আছে খনিজ, বনজ ও কৃষিজ সম্পদ, আছে সুপ্রাচীন সভ্যতা আর কৃষ্টি। কিন্তু যা নেই তা হল অস্ত্র আর অস্ত্রবিদ্যা। চৌরিচৌরার ঘটনা থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, শুধুমাত্র অসহযোগ কার্যকরী নয়। যদি আমাদের স্বাধীন-জাতিসত্ত হিসাবে জেগে ওঠার প্রয়োজন থাকে, তবে অবশ্যই আমাদের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। আজ থেকে আমরা অস্ত্র শিক্ষা শুরু করলাম—পরে আরও অনেক শিখব এবং স্বাধীনতার সুশৃঙ্খল সৈনিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলব। তারপর যেদিন আমরা বৃটিশ ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়ে দেশ-মাতৃকার দেহ থেকে পরাধীনতার কলঙ্ক ধুয়ে মুক্তি স্নান করব—সেই দিন হবে এ শিক্ষার শেষ। বন্দে মাতরম!

[মাষ্টারদা বসে পড়েন। সকলে অস্ত্রগুলি নির্মল সেনের কাছে জমা দেন।]

নগেন : একটা প্রশ্ন—প্রশ্নটা হচ্ছে : গত ১৮ সাল থেকে আমাদের এই সংগঠন, অথচ এত দীর্ঘ সময়ে আমরা মাত্র এই সামান্য ক'টা অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি, কেন আরও বেশী পারিনি, কি কারণে এত কম সাফল্য অর্জন করলাম ?

উপেন : এত সহজ কথা, আমাদের টাকা নেই, তাই বেশী অস্ত্র কিনতে পারছি না।

রজত : ঠিক কথা, টাকা থাকলে প্রচুর অস্ত্র পাওয়া যায়, সে যোগাযোগ যথেষ্টই আছে।

অনন্ত : আমার কিন্তু মনে হয়—টাকা নয়, আমাদের ইচ্ছা শক্তির অভাব, সাহসের অভাব। নৈলে ডাকাতি করে আমরা যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারতাম।

নরেশ : হ্যাঁ-হাঁ, ঠিক কথা—অন্য জায়গায় বিপ্লবীরা তো স্বদেশী ডাকাতি করে প্রচুর টাকা জোগাড় করেছে।

নির্মল : হ্যাঁ, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়—সে কথা সত্যি। মাষ্টারবাবু, এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

[সকলে মাষ্টারদার মন্তব্যের অপেক্ষা করেন।]

মাষ্টারদা : আমার মনে হয়, আমাদের লক্ষ্য কি—সেটাই আমরা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। যেদিন আমরা আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করব, সেদিন অস্ত্র বা অর্থ কোন কিছুরই অভাব থাকবে না। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় আমরা এগিয়ে যাব সে লক্ষ্য সাধন করতে—বিশ্বের কোন শক্তি আমাদের রুখতে পারবে না। সমস্যা পথের নয়—সমস্যা লক্ষ্যের। আসুন, আজ আমরা স্থির করি, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য : মাতৃভুমির পূর্ণ স্বাধীনতা !

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ লক্ষ্য একই রইল, তবু স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হল। সি. আর. দাস প্রভৃতি ইংরেজের দেওয়া প্রশাসনকেই তাঁদের হাতিয়ার করবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে মেতে উঠলেন। অপর পক্ষে, অন্যেরা ব্যস্ত হলেন অস্ত্র সংগ্রহ করবার জন্য। তীব্র আগ্রহ ঃ অস্ত্র চাই—অস্ত্র !

[অনন্ত সিংয়ের বাড়ীর ভিতর অনন্তর বাবা মায়ের মধ্যে আলোচনা চলছে।]

মা ঃ শোন, আজ যদি গলদা চিংড়ি পাওয়া যায় যেন নিয়ে আসে।

বাবা ঃ গলদা চিংড়ি।

মা ঃ হ্যাঁ, অনন্ত নারকোল দিয়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারী খেতে চেয়েছে। বল্লে, মা মেসের ঠাকুরের, রান্না খেতে খেতে মুখ একেবারে হেজে গেছে, কতদিন তোমার রান্না খাইনি, আজ একটু মালাইকারী করনা।

বাবা ঃ তা পাঁচুকে ব'লে দিও—আমি টাকা দিয়ে যাবখন।

মা ঃ বুঝলে, কলকাতার ঠাকুরদের রান্না একেবারে অখাদ্য ; সব কিছুতে বেশ করে মিষ্টি দিয়ে রাখে।

বাবা ঃ তা, তোমার রান্না যদি তারা খায় তো বলবে, "ওরে বাবারে জ্বলে গেলাম একেবারে !"

মা ঃ [হেসে] সে কথা ঠিক, তবু যার যেমন খেয়ে অভ্যাস। —তাই তো আর সহ্য করতে না পেরে ক'দিন মুখ পাল্টাতে অসময়েই বাড়ী চলে এল।

বাবা ঃ তা'ছাড়া—আমাদের এই কর্ণফুলি, এই সাগর আর পাহাড় পাবে কোথায়, কলকাতা তো একটা ঘিঞ্জি শহর !

মা ঃ হ্যাঁ, একদম মন টেঁকে না।

বাবা : মন টেঁকে না—বল্লে তো হবে না, পড়াশুনাটা তো করতে হবে। এখানে থাকলে ওর পড়াশুনা একদম হবে না। শোন, ইন্দুর পাকা-কথা বলার জন্য আজই যেতে হবে—সে কথা তোমার মনে আছে ?

মা : সে কি কথা—মনে থাকবে না কেন ?

বাবা : যাক, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি—সময় আর বেশী নেই।

[বাবা ভিতর বাড়ীতে চলে যান। মা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে জোড় হাত করে প্রণাম করেন। অনন্ত ও তার দিদি ইন্দুমতি আসেন।]

অনন্ত : তোর নাকি বিয়ের পাকা কথা হতে চলেছে ?

ইন্দু : যাঃ !

অনন্ত : হাঁা, তাই তো শুনলাম।

ইন্দু : ভ্যাট্ !

মা : হ্যাঁ সত্যি। ইন্দুর বিয়ে ঠিক হয়েছে—আজ উনি পাকা কথা বলতে যাচ্ছেন।

অনন্ত : তবে যে বড় 'ভ্যাট্-ভ্যাট্'—করছিলি ?

ইন্দু : তুই থামবি কিনা !

অনন্ত : এতে আবার থামা-থামির কি আছে—বিয়ে ঠিক হয়েছে তা বলতে এত লজ্জা কি ?

ইন্দু : দেখছ মা !

মা : হ্যাঁ অনন্ত, মেয়েদের নিজের বিয়ের কথা বলতে একটু লজ্জা হয় বাবা। যাকগে; শোন ইন্দু, তুমি বড় হয়েছ, পরের ঘর করতে যাবে—এখন থেকে তোমাকে অনেক বুঝে শুনে চলতে হবে; তুমি আজ থেকে আর বাড়ী থেকে বেরুবে না, তোমার ঐ ব্রতচারী, লাঠিখেলা-টেলা এখন ছাড়। যদি সইদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে খুব ইচ্ছে হয়—তাদের আসতে বলবে।

অনন্ত : হুররে—দিদি! [শানাই বাজাবার ভঙ্গী করেন, ইন্দুমতি কপট রাগ দেখান, অনন্ত হাসতে হাসতে] মা, আমার চিংড়ির মালাইকারী হচ্ছে তো ?

মা : [সস্নেহে] হবে রে—হবে। [হঠাৎ কিছু মনে পড়ে] পাঁচু, পাঁচু, ও পাঁচু ! [চলে যান]

ইন্দু : তুই হঠাৎ যে এখানে এলি ?

অনন্ত : এসেছি কিছু কারণ আছে। শোন দিদি, মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে চিত্তরঞ্জন দাস শুধুমাত্র আইনী পথে আন্দোলন চালাবার নীতি গ্রহণ করেছেন। শুধুমাত্র আইনী পথে চলার নীতি হচ্ছে চোরাবালি। নিশ্চয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই চোরাবালিতে ডুবে যাবে। তাই, এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের পার্টি নির্দেশ দিয়েছে : 'এখনই ঝাঁপিয়ে পড়—বীরত্বের আর সংগ্রামের উদাহরণ সৃষ্টি কর—যাতে ভারতবাসী তার মুক্তির পথ খুঁজে পায় !'

ইন্দু : ও, সেই জন্যে তাড়াতাড়ি কলেজের কোর্স শেষ হয়ে গেল—ছুটি দিয়ে দিল ?

অনন্ত : চুপ—শুনে ফেলবে !

ইন্দু : কিন্তু এত অস্ত্র তোরা পাবি কোথায় ?

অনন্ত : অস্ত্র অনেক আছে, কিন্তু টাকা চাই। আসল সমস্যা টাকা। —তাই আমি এসেছি বাবার ক্যাশ থেকে কিছু টাকা— [ভিতর থেকে বাবার গলার আওয়াজ শুনে চুপ করে যান। বাবা ও মা বাড়ীর ভিতর থেকে আসেন।]

বাবা : বেশ তো-বেশ তো—বিকেলেও ও যা খেতে চায় আনিয়ে নিও। হোষ্টেলের খাওয়া যে কি, তা'ত আমি জানি। যাক, আমি এখন রওনা হচ্ছি—দুর্গা-দুর্গা ! এই তো

অনন্ত, শোন, ইন্দুর বিয়ে ঠিক করেছি, আজ পাকা কথা হবে। ইন্দুকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে।

মা : ইন্দু, বাবাকে প্রণাম কর! [ইন্দু প্রণাম করেন]

বাবা : আমার ফিরতে রাত হতে পারে—চিন্তা ক'র না! দুর্গা দুর্গা! [বাবা চলে যান, মা হাত জোড় করে প্রণাম করেন।]

মা : হ্যাঁ রে, পাঁচুটা কোথায় গেছে জানিস—গরুগুলো আনতে হবে যে? বাজারটা ফেলে দিয়েই সরে পড়েছে। যা যা তোরাও আস্তে আস্তে স্নান টান সেরে আয়!

[মা চলে যান।]

অনন্ত : এই সুযোগ—মার বালিশের নিচ থেকে বাবার ক্যাশের চাবি জোগাড় করেছি।

ইন্দু : কিন্তু অনন্ত, তোরা যে বাবার টাকা নিবি—বাবা তো আমাদের বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না, তাঁর টাকায় কি বিপ্লবের কাজ হবে?

অনন্ত : দিদি, বাবা তেজারতী কারবারে বহু টাকা সঞ্চয় করেছেন, তার কিছু অংশ যদি দেশের কাজে লাগে তো ভালই হবে। তা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আজ বড়ই সংকটের মুখে—এখন যে করেই হোক অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ইন্দু : তবে যা, আর দেরী করিস না—মা এসে পড়তে পারে! ঠিক আছে; আমি এদিকটা পাহারা দিচ্ছি, তুই তাড়াতাড়ি কর! [অনন্ত পাশের ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হন।] কিন্তু অনন্ত, মা যে এত যত্ন করে চিংড়ির মালাইকারী রাঁধল—না খেয়ে চলে যাবি—এত বায়না করলি?

অনন্ত : দিদি, ভারতের স্বাধীনতার থেকে আমার মালাইকারী খাওয়া বেশী হল! অত বায়না করেছিলাম কেন জানিস—

আমার হঠাৎ এখানে আসার উদ্দেশ্যটা যাতে কেউ একটুও সন্দেহ করতে না পারে।

ইন্দু : তবে যা, আর দেরী করিস না! [অনন্ত পাশের ঘরে যায়, ইন্দু পাহারা দিতে থাকেন, পাশের ঘরে আলমারী খোলার শব্দ শোনা যায়। মা এ ঘরে আসেন। অনন্তকে শোনাবার জন্য গলা উচু করে] —কি মা? [পাশের ঘরে শব্দ থেমে যায়।] কি মা, কিছু বলবে?

মা : অত চেচাচ্ছিস কেন? কি আবার বলব! তুই এখনও স্নান করতে যাসনি—অনন্ত কোথায়?

ইন্দু : এই যাই।

মা : অনন্ত কোথায়?

ইন্দু : অনন্ত!

মা : হ্যাঁ-হ্যাঁ অনন্ত। মেয়ের অবস্থা দেখ, বিয়ের নাম শুনেই ভিরমী খেয়েছে। ওরে, অনন্তটা কোথায় গেল?

ইন্দু : অনন্ত—অনন্ত বোধ হয় স্নান করতেই গেছে।

মা : তাই? —যাই মালাইকারীটা হল কিনা দেখি—স্নান করে তো এক মিনিট দেরী সইবে না ছেলের! যা-যা তুইও স্নান-টান সেরে ফেল। শোন, ভাল করে একটু গা-টা রগড়ে তেল-টেল মেখ। আর দু'দিন পরে বিয়ে, অথচ মেয়ের কোন দিকে হুস্ নেই। কি করে যে শশুরের ঘর করবে এ মেয়ে—দিন-দিন শুধু ধিঙ্গিপনা বাড়ছে!

[চলে যান।]

ইন্দু : যাচ্ছি—বাবা—যাচ্ছি; খালি বকছে! [গলা নামিয়ে অনন্তের উদ্দেশ্যে] চলে গেছে। [ভিতরে আলমারী বন্ধের শব্দ শোনা যায়। অনন্ত আসেন] পেয়েছিস?

অনন্ত : এই একটা থলি বাইরে আলাদা করা ছিল, তাই রক্ষে। ভিতরের সিন্দুকের চাবি তো এ রিং-এ নেই—বোধ হয়

বাবাই নিয়ে গেছে। যাকগে, যা পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট !

ইন্দু ঃ তাড়াতাড়ি চলে যা ! ক'টায় ট্রেন ?

অনন্ত ঃ একটা তেতাল্লিশ। [বাইরে যেতে যেতে টাকার থলিতে আঁটা একটি কাগজে কিছু লেখা দেখে থমকে দঁাড়ান।] দিদি !

ইন্দু ঃ কি, কি হল রে ? [অনন্ত কাগজটি দেখালে সরবে পড়েন] "ইন্দুর বিয়ের খরচ।"

অনন্ত ঃ দিদি !

ইন্দু ঃ উঁ ?

অনন্ত ঃ এটা রেখে দি—নৈলে তোর বিয়ে হবে না, এ তোর বিয়ের টাকা !

ইন্দু ঃ না-না।

অনন্ত ঃ না দিদি, এখনই বাবা হয়ত এত টাকা যোগাড় করতে পারবে না। পাকাকথা হয়ে গেছে—টাকার জন্যেই হয়ত বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

ইন্দু ঃ না-না, অনন্ত তুই নিয়ে যা, টাকা বাবা ঠিক জোগাড় করতে পারবে ! আর না পারলেই বা—আমার বিয়ের তুলনায় ভারতের স্বাধীনতা কি ছোট নাকি—নিয়ে যা তুই !

অনন্ত ঃ দিদি, একটু প্রণাম করি তোকে ! [প্রণাম করেন]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ কেবলমাত্র নিজেদের বাড়ী থেকেই টাকা আনা নয়, অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আরও অনেক দুঃসাহসিক ডাকাতি করলেন বিপ্লবীরা। এর মধ্যে পরৈকোরা ডাকাতি, রেল ডাকাতি

বিখ্যাত। পুলিশও চুপ করে বসে রইল না—নাগড়াখানা পাহাড়ে হল এক মুখোমুখি সংঘর্ষ—ধরা পড়ে গেলেন বিপ্লবীরা।

[চট্টগ্রাম কোর্ট প্রাঙ্গণ]

সুখেন্দু : হুঁ, দেশ স্বাধীন করবে! যাকগে বাজে কথা—আদালত শুরু হবার আর দেরী নেই, তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে আসুন।

অভিভাবক : দেখুন, মোট দু'হাজারের একহাজার তো কলকাতাতেই দিয়ে আসা হয়েছে, বাকী একহাজার—না-না টাকা উনি সবই পাবেন, তবে—

সুখেন্দু : না-না সে হবে না, সে উনি কিছুতেই রাজী হবেন না।

অভিভাবক : আপনিই না হয় আমাদের হয়ে ওঁকে একটু অনুরোধ করুন না! এটাও তো দেশের কাজ—মানে—

সুখেন্দু : আহঃ! এক কথা কেন বারবার বলছেন? উনি তো আগেই বলে দিয়েছেন—আপনাদের এসব ডাকাতি-ফাকাতিকে উনি দেশের কাজ বলে মনে করেন না—টাকা ছাড়া এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই তিনি করবেন না।

[কোর্ট শুরু হবার ঘণ্টা শোনা যায়।]

অভিভাবক : তবুও যদি আপনি আর একবার অনুরোধ করেন, দয়া করে চলুন না!

সুখেন্দু : না-না, অত সময় নেই আমার—দেখছেন না কত কাজ। আমি জানি—ওঁকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। উনি তো আপনাদের মামলার জন্যই কলকাতা থেকে এসেছেন, বাড়ীতেই আছেন। পুরো টাকা দিয়ে দিন—কোর্টে উঠবেন। [সুখেন্দু ব্যস্ত ভাবে চলে যান, অভিভাবক উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করতে করতে নন্দ সিংকে দেখতে পান।]

অভিভাবক : নন্দ, ও নন্দ, ও নন্দ সিং! [নন্দ আসেন।]

নন্দ : ওদের নিয়ে এসেছে জেঠু—অনন্ত, অম্বিকাদা, মাষ্টারদা—সবাইকে।

অভিভাবক : কোথায় ?

নন্দ : ঐ তো—লকআপে রাখার জন্য এদিকেই আনছে।

অভিভাবক : শোন নন্দ, ওরা—আর সবাই গেলেন কোথায়. মানে, টাকা জোগাড় হয়েছে কিনা তুমি জান ?

নন্দ : আজ্ঞে না। রাঙ্গা কাকা আসেন নি এখনও ?

অভিভাবক : দেখছি না'ত। [সুখেন্দু আসেন]

সুখেন্দু : জোগাড় হয়েছে আপনাদের ?

অভিভাবক : আজ্ঞে— এখনও—

সুখেন্দু : আর হয়েছে আপনাদের। [চলে যান]

[পুলিশরা বন্দীদের নিয়ে এসে লকআপে ঢোকান, নন্দ দৌড়ে লকআপের কাছে যান।]

নন্দ : অনন্ত !

অনন্ত : দাদা, কতক্ষণ এসেছ ?

নন্দ : একটু আগে। তোদের কি সব এক জায়গায় রেখেছে ?

অনন্ত : না, আলাদা আলাদা সেল-এ।

কোর্ট সিপাই : [নেপথ্যে] বর্মাগ্রাম-ফর্টি-ফাইভ—বর্মাগ্রাম-ফর্টি-ফাইভ। আনসার আলী মোল্লা, আনসার আলী মোল্লা, গৌরহরি পোদ্দার, গৌরহরি পোদ্দার ! [অস্পষ্ট ভাবে আরও নাম শোনা যায়। সুখেন্দু আসেন।]

সুখেন্দু : ঐ কোর্ট শুরু হয়ে গিয়েছে—এর পরই আপনাদেরটা।

অভিভাবক : এসে পড়বে, এক্ষুণি এসে পড়বে।

উপেন : বাবা !

সুখেন্দু : এলেই ভাল। নৈলে আমাদের আর কি—

[অভিভাবক উপেনকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করছেন লক্ষ্য ক'রে] যান যান ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসুন

গিয়ে। [নিজের কাজে চলে যান।]

অভিভাবক : [উপেনের কাছে গিয়ে] কি খেতে দেয় তোদের ?

উপেন : এক বেলা ভাত, সন্ধ্যা বেলায় রুটি।

অভিভাবক : পেট ভরে তাতে ?

উপেন : ঐ কোন রকমে।

অভিভাবক : হুঃ, ঘরের ভাত খাচ্ছিলে—তা'ত সহ্য হ'ল না! যাক্‌গে, এই চিড়ে মুড়িগুলো রাখ, খিদে পেলে খাবি। [চিড়ে মুড়ির পুঁটুলিটি দেন।] শোন, পেট একদম খালি রাখবি না—খিদে পেলে কিছুটা খেয়ে নিবি! সবই তোমার কপালের ফের, আমি কি করব! যাকগে, মনটা চাঙ্গা রাখবি, একদম খারাপ করবি না! ভগবানই ভরসা, আমি আর কি করব! যাকগে, মনে খুব বল রাখবি, সবই কপালের ফের····· ভগবান! [কেঁদে ফেলেন।]

মাষ্টারদা : জে. এম. এর টাকা বোধহয় জোগাড় করতে পারেনি।

অম্বিকা : বোধহয়।

নন্দ : জেঠু, ঐ যে রাঙ্গা কাকারা এসে গেছেন।

[ব্যস্তভাবে রাঙ্গাকাকা ও অন্যান্যরা আসেন।]

অভিভাবক : জোগাড় হয়েছে ?

রাঙ্গাকাকা : হ্যাঁ।

অভিভাবক : পুরোটাই ?

রাঙ্গাকাকা : হ্যাঁ, কোন রকমে হয়ে গেছে।

অভিভাবক : চলুন, চলুন—কেস আরম্ভ হবার জোগাড়! তাড়াতাড়ি চলুন—উনি বাড়ীতে—টাকা হাতে না পেলে কোর্টেই আসবেন না।

নন্দ : শালা—আবার দেশপ্রিয় হয়েছেন!

রাঙ্গাকাকা : এই, চুপ কর। [দূরে দেখিয়ে] ঐ যে উনি আসছেন। বাড়ীতে গিয়ে সব টাকা গুণে দিলাম, তবে এলেন।

অভিভাবক ঃ যাক্, যাক্—কোন রকমে যে কেস্‌টা এটেণ্ড করান গেছে সেই রক্ষে! [যতীন্দ্র আসেন] আসুন, আসুন!

[সুখেন্দু কাগজপত্র নিয়ে আসেন]

সুখেন্দু ঃ স্যার, এরা বলছিলেন যে, এদের সব টাকা এখনও জোগাড় হয়নি—

যতীন্দ্র ঃ ও ঠিক আছে, সব টাকাই পেয়েছি। ফাইলপত্র সব তৈরী আছে তো? চল! চলুন!

[যতীন্দ্র, রাঙ্গাকাকা, সুখেন্দু চলে যান]

নন্দ ঃ [অনন্তর কাছে গিয়ে] টাকা ছাড়া কিছুতেই জে. এম. কোর্টে উঠছিল না।

অনন্ত ঃ তা'ত করবেই—আমরা যে একই দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করছি!

নন্দ ঃ যাই দেখে আসি! [যেতে যেতে মাকে দেখতে পেয়ে] অনন্ত, মা এসেছে! মা, ওমা, এদিকে এস—এই তো অনন্ত! [কোর্টের দিকে চলে যান। ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাবে অনন্তর মা, ইন্দুমতি ও মাষ্টারদার স্ত্রী আসেন।]

অনন্ত ঃ মা!

মা ঃ অনন্ত রে! [কেঁদে ফেলেন।]

অনন্ত ঃ কাঁদছ কেন মা, এতে কাঁদার কি আছে—দেশের জন্য ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীনরা প্রাণ দিয়েছে—

মা ঃ চুপ কর, তুই বুঝবি না রে—তুই চুপ কর!

অনন্ত ঃ দিদি, মাকে ধর!

ইন্দু ঃ ঠিক আছে। অনন্ত, মাষ্টারদাকে ডেকে দে—উনি মাষ্টারদার স্ত্রী।

অনন্ত ঃ তাই নাকি, আসুন-আসুন! [মাষ্টারদার স্ত্রী পুষ্পদেবী দূরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাছে এগিয়ে এলেন।] মাষ্টারদা, বৌদি এসেছেন!

মাষ্টারদা ঃ [কাছে গিয়ে] কেঁদ না ! আমার চিঠি পেয়েছ ?

পুষ্প ঃ হ্যাঁ, দুই খানা। আগেরটা সুকুমার দিয়েছিল—এবার দলিল রহমান দিয়েছে।

মাষ্টারদা ঃ কার সঙ্গে এসেছ ?

পুষ্প ঃ কেউ না।

মাষ্টারদা ঃ কেন, কাউকে সঙ্গে করে আনতে পারলে না ?

পুষ্প ঃ কাকে পাব, ডাকাতের বৌকে কি কেউ সাহায্য করে ? একা একা অনন্ত সিং এর মার কাছে এসেছি—তিনি কোর্টে নিয়ে এলেন।

মাষ্টারদা ঃ একা-একা. আত্মীয় স্বজনরা কেউ তোমাকে একটু এগিয়ে দিল না !

পুষ্প ঃ কে আমাকে এগিয়ে দেবে ? আমি তো কালামুখী অপয়া ! আমি অপয়া বলেই তো তুমি ঘরের বার হয়ে গিয়েছ—ওগো, কী লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই যে দেয় গো !

[কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।]

মাষ্টারদা ঃ পুষ্প, কেঁদনা পুষ্প ! ভাল কাজ করতে গিয়ে পৃথিবীতে সবাইকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে—অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তুমি আমার সহধর্মিণী; তোমাকে তো এটুকু কষ্ট সহ্য করতেই হবে পুষ্প।

পুষ্প ঃ কিন্তু আমি তো সাধারণ ঘরের মেয়ে, তোমার ঐ দেশের কাজের কি বুঝি ? আমি তো কিছুই বুঝি না গো !

মাষ্টারদা ঃ আমার চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়লে সব বুঝতে পারবে।

পুষ্প ঃ পড়ি তো, সব সময় পড়ি—আমার তো আর কিছু নেই—ঐ গুলোই বার-বার পড়ি। কতবার তো পড়লাম, কৈ কিছুই তো বুঝলাম না—কেন আমার কাছে তুমি নেই, কেন আমার সংসার হল না ? [দমকে কাঁদতে থাকেন]

মাষ্টারদা ঃ পুষ্প !

[সেপাইরা এসে লকআপ খোলে।]

সিপাই ঃ চলুন-চলুন, কোর্টে যেতে হবে !

মাষ্টারদা ঃ পুষ্প, দেশ-মাতৃকা আজও পরাধীনা— তোমাকে তো এসব সহ্য করতেই হবে পুষ্প ।

সিপাই ঃ চলুন-চলুন, সবাই চলুন !

[সকলকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল ।]

ইন্দু ঃ চলুন বৌদি, ওদের কোর্টে নিয়ে গেছে !

পুষ্প ঃ কেন-কেন-কেন ? [কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েন ।]

—দৃশ্যান্তর—

[গভর্ণরের খাস কামরা । গভর্ণর লর্ড লিটন নৈশ আহার করতে করতে পুলিশের বড়কর্তার বক্তব্য শুনছেন ।]

বড়কর্তা ঃ কিন্তু হুজুর, আমরা যতভাবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করাচ্ছি, সব গুলিতেই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে—কখনও সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে, কখনও উৎকোচ দিয়ে, কখনও জেরার কৌশলে ।

লর্ড লিটন ঃ সেটা আপনাদেরই অযোগ্যতা প্রমাণ করে। আপনারা যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করতে পারছেন না, তাই তারা বেরিয়ে যাচ্ছে ।

বড়কর্তা ঃ সে কথা ঠিক । কিন্তু মহামান্য, এ যাবৎ যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে—সমস্ত গুলির আসামীদেরই আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং যথেষ্ট প্রমাণাদিসহ আদালতে পাঠিয়েছি । অথচ প্রত্যেক বারই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এরপর আর আমাদের কি করবার থাকে হুজুর ?

লর্ড লিটন ঃ তবে কি আপনি বলতে চান যে, বিচারকরা তাদের পক্ষ টেনে বিচার করছেন ?

বড়কর্তা : মাফ করবেন মহামান্য, সে কথা বলা নেহাতই অন্যায় হবে—বিচারকরা সকলেই বিচক্ষণ, রাজভক্ত এবং বেশীর ভাগই ইউরোপীয়।

লর্ড লিটন : তবে ?

বড়কর্তা : মহানুভব, সত্য বলতে কি—বিচারকদেরও কিছু করবার উপায় নেই। কারণ আমাদের গণতান্ত্রিক বৃটিশ আইন। এই আইনের সাহায্যে এদের দমন করা অসম্ভব !

লর্ড লিটন : [গর্জন ক'রে] বৃটিশ গণতন্ত্র হচ্ছে বিশ্বে এ যাবৎ উদ্ভাবিত সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ – এ কথাটা ভুলে যাবেন না আপনারা !

বড়কর্তা : মহামান্য, আমার অপরাধ নেবেন না—আমার কথার মধ্যে আমাদের মহান গণতান্ত্রিক আইন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নেই ! আমার একটিই মাত্র স্পষ্ট বক্তব্য : আমাদের শত সতর্কতা সত্ত্বেও এই দুর্বৃত্তরা একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। লক্ষ্য করুন, গত বছর চট্টগ্রামের পরোই-কোরা ডাকাতির পরেই আবার মে মাসে কোনো-তে ডাকাতি হল ! তারপর······ [ফাইল থেকে কাগজ বের করে পড়তে শুরু করেন।] মে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ—উল্টো-ডাঙ্গা পোষ্ট অফিস ডাকাতি, আগষ্ট, ১৯২৩—শাঁখারী টোলা ডাকাতি, ডিসেম্বর, ১৯২৩—চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডাকাতি। আবার ডিসেম্বরে নাগড়াখানা পাহাড়ে খণ্ডযুদ্ধ এবং গুলুকবাহারে অস্ত্রাগার উদ্ধার। জানুয়ারী, ১৯২৪—মানে এ বছরের ঠিক গোড়াতেই—মিষ্টার ডে হত্যা। হুজুর, খেয়াল করবেন, এরা চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে মিষ্টার ডে-কে হত্যা করে। মে, ১৯২৪—চট্টগ্রামে সাব ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায় হত্যা। আরও অনেক রয়েছে। হুজুর, এইভাবে এরা বছরের পর বছর

নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি চালিয়ে যাচ্ছে—অথচ আমরা একজনকেও শাস্তি দিতে পারছি না।

লর্ড লিটন : কিন্তু—অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে তো বেরিয়ে যাবেই। আমাদের মহান গণতান্ত্রিক আইন বলে : শত-সহস্র অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজন নিরপরাধীও যেন শাস্তি না পায়।

বড়কর্তা : সে অত্যন্ত চমৎকার কথা মহানুভব, কিন্তু এরা তো সাধারণ অপরাধী নয়। এরা সাধারণ অপরাধীদের মত নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে কিংবা নিজেদের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করতে ডাকাতি করেন ; করে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এবং সে অস্ত্রের লক্ষ্য : মহান বৃটিশ সাম্রাজ্য। অতি স্পষ্ট উদ্দেশ্য : ভারতের মাটি থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন। মহানুভব, এদের ক্ষেত্রেও কি আমাদের আইন সমান ব্যবহার করবে? মহানুভবের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি, সেই সব সৎ ও সুসভ্য বৃটানীয়ার সন্তানদের দিকে, যাঁরা বিভিন্ন জীবিকার প্রয়োজনে এই জংলী দেশে পড়ে আছে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত হয়ে। আমি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই সব শিষ্ট ভারতীয় প্রজাদের দিকে যাঁরা ন্যুনাধিক দু'শ বছর ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অকুণ্ঠ সেবা করে আসছেন এবং যাদের জীবন আজ এই স্বদেশী গুণ্ডাদের হাতে সর্বদা বিপন্ন।
মাননীয় কি আজ—[বাইরে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায়]

লর্ড লিটন : আঃ! — বাইরে এত কিসের গোলমাল? [বড়কর্তার সহকারী বাইরে যান, গোলমাল থেমে যায়।] ওখানে কারা এত রাত্রে হৈ চৈ করছে?

বড়কর্তা : হুজুর, কলকাতার প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ইউরোপীয় ভদ্র-

লোকেরা আপনার মতামত জানবার জন্য এই গভীর রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন, তাঁরা ভীষণ ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। আপনি কি তাঁদের ঐ গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন—না তাঁদের প্রাণ রক্ষা করবেন?

লর্ড লিটন : কিন্তু বিনা বিচারে আটকে রাখা তো সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক!

বড়কর্তা : সম্পূর্ণ মানছি। কিন্তু—হুজুর, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বৃটেনে এই আইন প্রয়োগ করলে অবশ্যই অগণতান্ত্রিক হত, কিন্তু ভারতবর্ষে নয়। কারণ এখানে আর একটা জাতির অস্তিত্ব রয়েছে—এই কালরঙের ভারতীয়রা। এদের ক্ষেত্রে সমান গণতান্ত্রিক সুবিধা দিতে গেলে এক বিশাল সংখ্যক জীবন ধ্বংস হবে। ভেবে দেখবেন হুজুর, একদিকে মুষ্টিমেয় স্বদেশী গুণ্ডাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, অন্যদিকে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত ইউরোপীয়গণের অকালে অসহায় ভাবে মৃত্যু—এর কোনটি আপনার কাম্য!

লর্ড লিটন : ঠিক আছে—ঠিক আছে, পড়ুন কি লিখেছেন—আমি সই করে দিচ্ছি।

বড়কর্তা : অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। [কাগজ বের করে পড়তে শুরু করেন।] বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট : আজ দেশের গণতান্ত্রিক, সৎ ও সুসভ্য নাগরিকদের ধন ও প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে মহামান্য লর্ড লিটন বাহাদুর সন্তোষ সহকারে এই বিশেষ আদেশ জারী করিতেছেন যে, এই আইন বলে যে কোন ব্যক্তিকে দেশের স্বার্থে বিনা বিচারে দুই বৎসর কাল পর্যন্ত আটক করিয়া রাখা চলিবে। আসামী পক্ষ কোন প্রকারেই আদালতে বিচার প্রার্থনা করিতে

পারিবে না। [কাগজখানি লর্ড লিটনের সামনে এগিয়ে ধরা হলে তিনি মর্মাহত ভাবে স্বাক্ষর করেন।]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ সেই এক রাত্রের মধ্যেই মোট ৭৪ জন গ্রেপ্তার হলেন, তবে মাষ্টারদাকে তখনই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হলেন দু'বছর পর, অর্থাৎ ১৯২৬ সালে ১০ই অক্টোবর কলকাতার রাস্তা থেকে।

[চট্টগ্রামে বিপ্লবী সাম্যাশ্রমের গোপন বৈঠক।]

মাষ্টারদা ঃ বন্ধুগণ, আজ দীর্ঘ কারাবাসের পর আমরা আবার মিলিত হয়েছি। আজ একটা অতিশয় সুখের খবর হচ্ছে ঃ সারা বাংলাদেশে বিপ্লবীদের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে এবং চট্টগ্রামেও সম্মিলিত কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। সারা বাংলা তথা সারা ভারতে নতুন ভাবে আমাদের বিপ্লবের পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য এই সমিতি আজ ডাক দিয়েছে। অস্ত্রের জন্য আমাদের চিন্তার কিছু নেই, কারণ—সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েই আমরা তাদের শেষ করব। বন্ধুগণ, প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলে নিতে চাই যে, আমাদের পূর্ববর্তী কাজে কিছু ত্রুটি ছিল। এক ঃ আমরা আইনী লড়াইকে একদম বাতিল করে চলছিলাম। দুই ঃ জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলাম। এখন থেকে আমাদের সে সব ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে হবে। তাই আইনী সংগ্রামকে বিপ্লবের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে আমাদের কংগ্রেসে প্রবেশ করতে হবে এবং ব্যাপক জনসংযোগ গড়ে তুলতে হবে। সে উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম সমিতি গঠন, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতি-

ষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে আরও বেশী বেশী যুবকরা দেশের কাজে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু বন্ধুগণ, আমাদের অবশ্যই একথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা এবং তার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি। আসুন, আজ আমরা নব গঠিত সম্মিলিত কাউন্সিলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন প্রেরণায় এবং উদ্যমে ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের আপ্রাণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি—বন্দে মাতরম্!

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার : কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য ; এই আইনী ও বেআইনী লড়াই নিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত হল। যতীন্দ্র মোহনের দল চাইলেন—আইনী পথে সীমাবদ্ধ অধিকার। আর সুভাষ বসুর দল চাইলেন—দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। দেশের সমগ্র যুব সমাজ পরস্পর-বিবাদমান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

[যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীর বৈঠকখানা।]

মহিম : আপনি তো জানেন, সংগঠন কর্মীর অভাবে প্রায় অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, তাই এদের সংগঠনে না এনে কোন উপায়ও ছিল না। তা'ছাড়া এরা সমস্ত রকমের সাংগঠনিক কাজ কর্মের প্রচুর উন্নতিও করেছে। আসল কথা কি—কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী এদের একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে—এরা তার অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছে।

যতীন্দ্র : কিন্তু আপনারা আমার এতদিনের বন্ধু, এতদিনের সাথী হয়ে আমার এত বড় অপমানটা সহ্য করলেন কি করে?

আমাকে একবার জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না আপনারা ! আমারই জেলা সম্মেলনে সুভাষকে সভাপতি করে নিয়ে এলেন ?

ত্রিপুরা : মানে, ওরা বলল—আমরা সকলে মিলে একটা কিছু করলে জে. এম. নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।

যতীন্দ্র : এত বড় ভুলটা আপনারা করলেন কি করে—একবার ভাবলেন না—এটা আমার কত বড় অপমান ? যেখানে সারা দেশের কাছে আমি গর্ব করে বেড়াই—চাঁটগা আমার দুর্ভেদ্য দুর্গ, চাঁটগাবাসী আমাকে মুকুটহীন রাজা বলে—আর সেই চাঁটগা জেলা সম্মেলনে আমাকেই বাদ দেওয়া হ'ল—বাঃ। এল কে—না সুভাষ, যে সুভাষ প্রাদেশিক কমিটিতে আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। সারা দেশের লোক এখন কি ভাববেন ? যে ব্যক্তি নিজের জায়গাতে অপ্রিয় হয়ে পড়েছে তার উপর আর তাঁরা ভরসা করবেন কি করে ? কি করলেন আপনারা—ঐ সূর্য সেনদের কথায় ভুললেন ? আপনারা জানেন না—ওরা সন্ত্রাসবাদী, খুন-খারাপী, মারামারি ওদের রাজনীতি ?

মহিম : আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। শত হলেও সূর্য এখন সেক্রেটারী—কমিটিতেও এখন ওদের লোকজন বেশী। ওদের কথা ফেলি কি করে ?

যতীন্দ্র : বুঝতে পারেন নি—ওরা আপনাদের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে অস্ত্র ছুঁড়ছে ?

১ম যুবক : ঠিক-ঠিক, ওরা আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে নিজেরা নিজেরা সব করছে দাদা। আর জানেন, কলকাতা কংগ্রেসে যাতে কেবল ওদের লোকই প্রতিনিধি হয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টাই করছে।

যতীন্দ্র : তা হলে তো সর্বনাশ !

২য় যুবক : সে আমরা কিছুতেই হতে দেব না দাদা, যে করেই হোক, ভোটে ওদের জিততে দেব না।

১ম যুবক : কি করবি ?

২য় যুবক : সে দেখিস না। আপনি থাকছেন তো ? আপনি থাকলে খুব সুবিধা হয়, মানে—আপনার উপস্থিতিটাই অনেক—

ত্রিপুরা : সে কথা এক'শ বার—আপনি থাকলে অনেকেরই মন পাল্টে যাবে। ব্যক্তিত্বের একটা ব্যাপার আছে তো।

যতীন্দ্র : না-না, আমি থাকব না—এমন কি কংগ্রেস অফিসেও যাব না, দু'দিন বাদেই কলকাতা চলে যাব।

মহিম : সে কি !

যতীন্দ্র : হ্যাঁ। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলবেন—কোর্টে একটা কেস ছিল তাই এসেছিলাম। আমি যে সম্মেলন সম্পর্কে কোনও আলোচনা করেছি—কেউ যেন জানতে না পারে।

মহিম : কেন-কেন ?

যতীন্দ্র : সে কথা পরে বলব। সমস্যা হচ্ছে—সুভাষ আসছে আমার পরিবর্তে—অন্ততঃ আপনারা যদি আমাকে আগে জানাতেন ! আমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে এলে সেও একরকম হ'ত। কিন্তু এখন এ অপমানের জ্বালা যে সহ্য করা মুশকিল ! এরপর আবার সুভাষ যদি এখান থেকে নিশ্চিন্তে নিরাপদে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে যায়—।

১ম যুবক : না-না, সে আমরা কিছুতেই হতে দেব না—শহরের সমস্ত ধনী মানী লোকেরা আমাদের পক্ষে—।

মহিম : ঠিক-ঠিক, বুঝলেন ত্রিপুরাবাবু, জেলা সম্মেলনে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে জিততে পারি !

ত্রিপুরা : হ্যাঁ-হ্যাঁ, একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। একটু চেষ্টা করলেই আমরা জিতে যাব।

২য় যুবক ঃ যদি জিততে নাও পারি ওদের সভা বানচাল করে দেব। দাদা, আপনি অনুমতি দিন দাদা—যে করেই পারি ওদের বানচাল করে দেব!

১ম যুবক ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, দরকার হলে সবই করতে পারব আমরা। আপনি শুধু অনুমতি দিন।

যতীন্দ্র ঃ অনুমতি দেবার কি আছে—আপনারাও রাজনীতি করেন; ভেবে দেখুন—কি করা উচিৎ।

যুবকগণ ঃ ঠিক আছে দাদা।

মহিম : ঠিক-ঠিক, একটা কিছু করতেই হবে—এত বড় অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না।

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রাম শহরে যাত্রামোহন হলের সম্মুখ ভাগ। ভিতরে জেলা সম্মেলন চলছে। হলের সামনে নানান পোষ্টার ঝুলছে, তার মধ্যে একটি পোষ্টারে লেখা আছে—'দেশ আগে, ন্যায় নীতি ধর্ম পরে।'

সুভাষচন্দ্র ঃ [নেপথ্যে] আজ সারা পৃথিবীর জাগ্রত যুবশক্তি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মত ফেটে পড়ে জগতের আবর্জনা দূর করবে এবং এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। এই জাগ্রত যুবশক্তি চীনের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, তুর্কী জাতির মধ্যে নব আশার সঞ্চার করেছে এবং দুর্বল মন্ত্রণাপন্ন রুশ দেশে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছে। আজ আমাদের দুঃখিনী জন্মভূমিও আকুল প্রতীক্ষারতা—কতক্ষণে আমরা জেগে উঠব। এখানে এসে চট্টগ্রামের যুবকদের যে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেখলাম তাতে আমি খুবই প্রীতি অনুভব করেছি। তাঁদের আমি আন্তরিক অভি-

নন্দন জানাচ্ছি এবং আরও বেশী করে দেশের কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলে নিই : অনেকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই জানাই বাপুজীর প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও গভীর আস্থার কথা। কিন্তু আমি অহিংস অসহযোগের পথে দেশ উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা দেখতে পাই না। যখন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র নখর আমাদের জাতি সত্তার মর্মে চূড়ান্ত আঘাত করছে, তখন অহিংস ভাবে শুধু মার খাওয়ার নীতি কি ভাবে আমাদের বাঁচাতে পারে— আমি বুঝতে পারি না। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার উচ্চ শ্রদ্ধা থাকলেও…।

১ম যুবক : শালা, তোরা কি করে বুঝবি—অস্ত্র ছাড়া তোরা আর কি বুঝিস ? [অন্যরা হেসে ওঠে।]

সুভাষচন্দ্র : ‥ …যাই হোক, আমাদের চলার পথই শিক্ষা দেবে যে, কোনটা প্রকৃত পথ আর কোনটা ভুল পথ। আজ আমরা পথের দ্বন্দ্বে একথা যেন না ভুলি যে, আমাদের লক্ষ্য—জন্মভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা, আর জীবন পথের ধ্রুবতারা হচ্ছে জলন্ত দেশপ্রেম! ইন্‌কিলাব! [জনতা প্রতিধ্বনি করে—জিন্দাবাদ।] বন্দে মাতরম্। [জনতা প্রতিধ্বনি করে—'বন্দে মাতরম্' এবং হাততালিতে ফেটে পড়ে।]

বক্তা : [নেপথ্যে] এতক্ষণ বক্তব্য রাখলেন চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলনের সভাপতি তথা সারা ভারতের বিপ্লব-প্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। এরপর তিনি শহীদ স্মৃতিতে মাল্যদান করবেন। [হাততালি]

২য় যুবক : শুধু রক্ত, খুন খারাপি আর এলোমেলো করে দেমা

লুটেপুটে খাই !

৩য় যুবক : দেখছিস না—কি পোষ্টার লাগিয়েছে।

১ম যুবক : আরে একি—'দেশ আগে, ন্যায় নীতি ধর্ম সব পরে !' ন্যায় নীতি সব বিসর্জন দিতে হবে নাকি—কোন পাপই আর পাপ থাকবে না—বলে কি এরা ? না-না এসব তো কিছুতেই চলতে দেওয়া চলে না, চল তো— !

২য় যুবক : হ্যাঁ-হ্যাঁ, চল-চল—কোন ন্যায় নীতিই যখন নেই— আমরাও সভ্যপত্র ছাড়াই হলে গিয়ে ঢুকি !

৩য় যুবক : হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক কথা—আমরাও তো দেশ সেবা করতে চাই, তবে ?

১ম যুবক : আরে কোন নিয়ম কানুনই যখন নেই—আমাদেরও ওরা বাধা দিতে পারে না।

সকলে : হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই চল ! [হলের গেটের দিকে এগোয়।]

লোকনাথ : দাঁড়ান, কার্ড দেখিয়ে ভিতরে ঢুকুন।

১ম যুবক : ওসব কার্ড-ফার্ড নেই।

নরেশ : না-না, কার্ড ছাড়া ভিতরে যাওয়া চলবে না।

২য় যুবক : চলবে না মানে—যেতে দিতেই হবে !

লোকনাথ : 'দিতেই হবে'—মানে ? মেম্বারশীপ কার্ড নেই, তবু ভিতরে যেতে দিতেই হবে ! এটা কি মামদোবাজী পেয়েছ ?

যুবকগণ : এই খবরদার—মুখ সামলে কথা বলবি !

নরেশ : আরে যাও যাও !

৩য় যুবক : মামদোবাজী আমরা করছি না তোমরা করছ—হলের বাইরে লিখেছ—"দেশ আগে, ন্যায় নীতি ধর্ম পরে"— এখন আমাদের ঢুকতে দেবে না কেন ?

২য় যুবক : আমরাও দেশ সেবা করতে চাই।

১ম যুবক : আমরাও কোন আইন কানুন মানি না।

৩য় যুবক : তবে ভেতরে যেতে দেবে না কেন ? চল-চল, কোন

কথা নেই—চল ! [ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। বাইরে গোলমাল শুনতে পেয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী, মাষ্টারদা, মহিমবাবু প্রভৃতি এসে গেটের কাছে দাঁড়ান।]

অম্বিকা : দাঁড়ান, শুনুন, আপনারা একটা কথা শুনুন ! দেখুন, আপনারা পোষ্টারটার ভুল অর্থ করছেন। এর অর্থ হচ্ছে—পুরানো ন্যায় নীতির কাঠামোটিকে আজকের নতুন পরিস্থিতিতে একটু নতুন ভাবে সাজান দরকার। আজ আমাদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে—দেশকে স্বাধীন করা। তাই আজ সাময়িক ভাবে সমস্ত ন্যায় নীতিকে সেই মানদণ্ডেই তৈরী করতে হবে। বীর সন্যাসী বিবেকানন্দও বলেছেন—যতদিন পর্যন্ত দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে গীতাকে আস্তা কুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও ! তিনি আরও বলেছেন—আগামী পঞ্চাশ বছর যুবকদের সাধনা হোক : শুধুমাত্র দেশের সেবা ! সুতরাং একথা দিয়ে এ বোঝায় না যে, কোন রকম ন্যায় নীতি আমরা মানি না।

১ম যুবক : আরে ষান মশাই—ন্যায় নীতি ধর্ম সব সময়েই সবার উপরে, কোন এক সময় তা দেশপ্রেমের নিচে নেমে আসতে পারে না। তাই তো বাপুজী বলেছেন—আই ক্যান স্যাক্রিফাইস্ মাই কান্ট্রি ফর লয়ালটী এণ্ড ট্রুথ্।

৩য় যুবক : বাংলায় বলে দাও নৈলে হয়ত মানেই বুঝবে না।

[ব্যঙ্গ শুনে যুবকেরা হেসে ওঠেন।]

১ম যুবক : কথাটার মানে হচ্ছে—নীতি ও সত্যের জন্য আমি দেশকে বিসর্জন দিতে পারি।

লোকনাথ : ব্যাস-ব্যাস, আর মানে বলে দিতে হবে না। ওর মানে হচ্ছে : নীতির দোহাই দিয়ে বৃটিশ রাজ-শক্তিকে এদেশে কায়েম রাখা।

যুবকগণ : হেস্-শালা,—মুখে যা আসে তাই, মার, মার শালাদের।

এত বড় অপমান—ঢোক সব ঢোক ! [আবার ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়।]

অম্বিকা ঃ শুনুন-শুনুন—একটু থামুন ! দেখুন, আপনারা হলের ভিতরে যেতে চাইছেন কিন্তু হলের মধ্যে সদস্যদেরই জায়গা হচ্ছে না। সেখানে আরও বেশী লোক ঢোকালে সভাই পণ্ড হয়ে যাবে।

যুবকগণ ঃ সে সব আমরা জানি না। আমরা ভিতরে যাবই।

মহিম ঃ আমি একটা প্রস্তাব করছি ঃ সভাটাকেই হলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক। কারণ, বাইরে উপস্থিতদের মধ্যে অনেক সভ্যও রয়েছেন।

মাষ্টারদা : না, তা হতে পারে না—জেলা কংগ্রেস সম্মেলন সদস্য-দের জন্য—তাঁদের রাজনৈতিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কয়েকজন হুল্লোড়বাজের হল্লাবাজীর জন্য সে সভার গাম্ভীর্য আমি নষ্ট করতে পারি না।

১ম যুবক ঃ এঃ, এখন তো দেখি বড় ধর্মজ্ঞান ! তবে ঐ পোষ্টার লাগিয়েছ কোন কাণ্ডজ্ঞানে ?

২য় যুবক ঃ অত কথায় কাজ কি—ছিড়ে ফেল !

যুবকগণ ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছেড়-ছেড়—ছিড়ে ফেল, ছিড়ে ফেল ঐ ন্যায় নীতিহীন পোষ্টার ! [পোষ্টার ছিড়তে থাকেন। অনন্ত সিং ও অন্যরা লাঠি সোঠা নিয়ে আসেন।]

অনন্ত ঃ খবরদার—পোষ্টারে হাত দিয়েছিস তো হাত ভেঙ্গে ফেলব একেবারে ! এ কি, ছিড়ে ফেলেছে ?

১ম যুবক ঃ [একটু পিছিয়ে] ছিড়ব—একশ বার ছিড়ব, তোদের এই শয়তানের সম্মেলন ভণ্ডুল করে দেবরে শালা !

[ইট ছুড়তে থাকেন।]

অনন্ত ঃ তবে রে—তোদের একটু শাস্তির দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি। [হাঙ্গামা বেধে যায়, পরে অনুশীলন যুবকগণ পালিয়ে যান।]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ এই ঘটনার পর আরও একটি ঘটনা ঘটে জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনের দিন। নির্বাচন নির্বিঘ্নে হয়ে যায় এবং সুভাষ পক্ষই জয়লাভ করেন।

[চট্টগ্রাম টাউন হলের সম্মুখে বিজয় সভা]

নির্মল ঃ আজ এই নির্বাচনে এই জয় প্রমাণিত করে যে, এই জেলার অধিবাসীবৃন্দ বিপ্লবী পন্থায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনেই বেশী আগ্রহী। আমাদের কর্মীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। যাঁরা আজ নির্বাচিত হলেন আজ থেকে তাঁদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের ধ্যান জ্ঞান হতে হবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। অতএব—

[হঠাৎ একদল যুবক হুড়মুড় করে ঢোকেন।]

১ম যুবক ঃ আর অতএব-অতএব করতে হবে নারে শালা।

২য় যুবক ঃ অতএব তোমাদের সভা পণ্ড।

৩য় যুবক ঃ শালারা, ধাঙ্গড় আর কুলী-কামিনদের ভোটে জিতে আবার বড়াই হচ্ছে, ভাঙ্গ-ভাঙ্গ, শালাদের বিজয় উৎসব পণ্ড করে দে।

[মুহূর্তে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একজন যুবক একটি চেয়ার দিয়ে মাষ্টারদাকে আঘাত করেন। চিৎকার ওঠে —"মাষ্টারদাকে মেরে ফেলল—মাষ্টারদাকে মেরে ফেলল।"

[অনুশীলন-যুবকেরা পালিয়ে যান।]

উপেন ঃ আপনারা সকলে তাকিয়ে দেখুন ঃ আমাদের প্রিয় নেতা মাষ্টারদার কপাল থেকে রক্ত ঝরছে! ওরা মাষ্টারদাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল।

[সকলে মাষ্টারদাকে দেখে উত্তেজিত হন, লাঠি, ভাঙ্গা চেয়ারের হাতল, ইট পাটকেল নিয়ে প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হন। আওয়াজ ওঠে—প্রতিশোধ-প্রতিশোধ।]

অনন্ত ঃ দাঁড়ান, দাঁড়ান আপনারা, মাষ্টারদা আপনাদের কিছু বলবেন। [জনতা থমকে দাঁড়ায়।]

মাষ্টারদা ঃ বন্ধুগণ, আজ যাঁরা আমাদের ভোটে জয়যুক্ত করেছেন তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধীদের অনেক অপচেষ্টাকে অতিক্রম করে আজ এই জয় ··· ···

জনতা ঃ প্রতিশোধ-প্রতিশোধ !

মাষ্টারদা ঃ বন্ধুগণ, আপনারা খুবই উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন সত্য ! কিন্তু একটি কথা আপনাদের স্মরণ রাখতে আমি অনুরোধ করছি যে, শুধু মাত্র কংগ্রেসের মধ্যকার দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ঃ ভারতের মাটি থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ। সুতরাং আজ আমাদের এই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে কিছুতেই শক্তির অপচয় করা উচিৎ নয়। এই সামান্য দ্বন্দ্বকে আমাদের সামান্য ভাবেই দেখতে হবে, উপেক্ষা করতে হবে। আমি আশা করি আমরা কিছুতেই আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হব না। আমার একান্ত অনুরোধ আজ আপনারা সকলে শান্ত ভাবে বাড়ী ফিরে যান !

নরেশ ঃ সবাই যে যার হাতিয়ার আছে ফেলে দাও আর লাঠিগুলি এখানে জমা দাও ! [স্বেচ্ছাসেবকরা নিরবে লাঠিগুলি জমা দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যেতে থাকেন। হঠাৎ পিছন থেকে দুজন অনুশীলন যুবক এসে সুখেন্দু নামে এক বালকের পিঠে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন।]

নির্মল ঃ সুখেন্দু ! [আততায়ীদের ধরতে যান। যুবকেরা তাঁর হাতে ছুরির আঘাত করে পালিয়ে যান। কিছু স্বেচ্ছা সেবক আততায়ীদের ধরতে উদ্যত হন। গণেশ আহত নির্মল সেনকে ধরেন। অনন্ত সুখেন্দুকে কোলে করেন।]

সুখেন্দু ঃ মাষ্টা···র · দা—মা ষ্টার · দা !

অনন্ত ঃ মাষ্টারদা, আমরা কি এই ভাবে শেষ হয়ে যাব ?

মাষ্টারদা ঃ না অনন্ত, এর জবাব হচ্ছে ঃ বৃটিশের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ। চলুন—সকলে চলুন, একে জলদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। [সকলে হাসপাতালের দিকে যেতে উদ্যত হলে একদল পুলিশ তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ান।]

দারোগা ঃ দাঁড়ান, আপনাদের মধ্যে সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন গ্রেপ্তার !

[সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান।]

ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ঃ

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

সূত্রধার ঃ আকাশে আকাশে ধ্রুব তারায়,
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়—
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়
জানেনা কেউ।

[কোন গোপন আস্তানা। গুরুত্বপূর্ণ সভা চলছে।]

মাষ্টারদা ঃ শুধু চট্টগ্রাম মুক্ত হলেই সারা ভারতবর্ষ মুক্ত হবে না— একথা ঠিক। কিন্তু আমরা যদি এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের সাময়িক ভাবেও পর্যুদস্ত করতে পারি—সে বিজয় ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করবে। চট্টগ্রামের এই পথ, এই আদর্শ অনুসরণ করে সারা ভারত জেগে উঠবে। তারপর সেই জাগ্রত ভারত উল্কার বেগে এ দেশের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সুতরাং সাথীরা, ভাই বোনেরা, আজ যদি আমাদের সকলের মৃত্যুও হয় তবু এ কর্মসূচী কার্যকারী করতেই হবে। বৃটিশ শক্তি যে অপরাজেয় নয়—প্রমাণ করতেই হবে। এখন আমাদের পরিকল্পনাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

অম্বিকা ঃ আমাদের এই দলের নাম ঃ ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা। আর এই বাহিনীর সভাপতি—শ্রীযুক্ত সূর্যসেন।

নির্মল ঃ এ আমাদের সকলেরই মনের কথা। আমরা সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

সকলে ঃ সকলেই সমর্থন করছি।

মাষ্টারদা ঃ আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে অনেকগুলি ঘাঁটি আক্রমণ করব এবং সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করে ফেলব। আমাদের সামগ্রিক যুদ্ধের সেনাপতি—ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ। [গণেশ উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন।] এবং সহকারী সেনাপতি শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং। [অনন্ত সিং উঠে অনুরূপ অভিবাদন করেন।] গণেশ, এখন তুমি সম্পূর্ণ কার্যসূচীটি বুঝিয়ে বল।

গণেশ ঃ প্রথমে—রাত ঠিক দশটার সময় উপেনের নেতৃত্বে নাঙ্গালকোট এবং লালমোহনের নেতৃত্বে ধূম ষ্টেশনের কাছে রেল লাইন উপরে ফেলতে হবে এবং একই সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কেটে চট্টগ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। [একখানি কাগজ বের করে দেখেন।] উপেনের সঙ্গে থাকবে বিজয়, শঙ্কর এবং সুশীল। আর লালমোহনের সহযোগী হবে সুবোধ, সুকুমার এবং সৌরীন্দ্র।

অম্বিকা ঃ তারপর ?

গণেশ ঃ তারপর, অম্বিকাদা'র নেতৃত্বে রাত ঠিক দশটায় কালীপদরা টেলিফোন ভবন ধ্বংস করবে। একই সময়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করবে নির্মলদার নেতৃত্বে লোকনাথরা।

নরেশ ঃ আর ?

গণেশ ঃ চট্টগ্রাম থেকে বৃটিশ শক্তিকে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে চাই, তাই নরেশের নেতৃত্বে কয়েকজন গিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবে। ওদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে জালিয়ানওয়ালা বাগের প্রতিশোধ নেওয়া চাই।

ট্যাগরা ঃ প্রতি গুলিতে একটি করে সাবাড় করব দাদা।

[সকলে হেসে ওঠে]

গণেশ ঃ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহারগুলি সমস্ত শহরে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে জনসাধারণ আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। আর পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করব আমরা, অর্থাৎ—আমি, অনন্ত ও অন্যরা। মাষ্টারদা কিছু দূরে বাকীদের নিয়ে সামগ্রিক পরিচালনার জন্য অপেক্ষা করবেন। কাজ শেষ হলে সকলে আমরা পুলিশ অস্ত্রাগারে মিলিত হব এবং তারপর শহরে প্রবেশ করব। আশা করি, এ কর্মসূচীতে আমরা সকলেই একমত ?

সকল ঃ হ্যাঁ, আমরা সকলেই একমত।

গণেশ ঃ এবার আসুন আমরা শপথ বাক্য পাঠ করি। [সকলে এগিয়ে এসে মাষ্টারদার হাতে রাখা গীতা ছুঁয়ে দাঁড়ান, এবং গণেশের সঙ্গে সঙ্গে শপথ বাক্য আবৃত্তি করেন।] আমরা, ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা, এই শপথ করছি যে, মাষ্টারদা সূর্যসেনের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

অনন্ত ঃ মাষ্টারদা, দিন ধার্য করুন !

মাষ্টারদা ঃ যুব বিদ্রোহের রণভেরী বেজে উঠবে—উনিশ'শ ত্রিশ সালের আঠারই এপ্রিল, শুক্রবার রাত ঠিক আটটায় !

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার।] একজন প্রহরী বন্দুক কাঁধে টহল দিচ্ছেন। অন্য পাঁচজন প্রহরী এক জায়গায় বসে। তাদের একজন সুর করে রামায়ণ পড়ছেন, অন্যরা মনযোগ দিয়ে শুনছেন। দূরে অন্ধকারে মাষ্টারদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মাষ্টারদার গায়ে সাদা

লঙ কোট, মাথায় গান্ধী টুপি, তাতে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকা সিম্বল-ট্যাবলেট লাগান এবং বুকে রিপাব্লিকান আর্মির ব্যাচ। তিনি মালকোচা দিয়ে ধুতি পরেছেন আর পায়ে পরেছেন সাদা কেটস্।]

পাঠক পুলিশ ঃ শয্যায় বসিয়া বুড়ি দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ী গণে॥
ত্রিজটা বলেন সীতা রামের কামিনী।
সীতারে যে মারে সে মরিবে আপনি॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে আইস সবে মোর স্থান॥

[বাইরে অনন্ত সিংহের জিপ এসে দাঁড়ায়। সেই জিপের হেড লাইটের আলোয় মাষ্টারদাকে দেখা যায়।]

সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনি লাগি ত্রাস॥
রক্ত বস্ত্র পরিধানা কালো হেন বুড়ি।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চুন।
লঙ্কা দাহ করে আর রাক্ষসেরা খুন॥

[অনন্ত, গণেশ ও তাঁদের সহযোগীরা আসেন। তাঁদের পুলিশের পোষাক। তাঁরা মাষ্টারদাকে সৈনিকের কায়দায় অভিবাদন করেন।]

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বান করে।

মাষ্টারদা ঃ সব ঠিক আছে?

গণেশ ঃ হ্যাঁ, সব ঠিক।

পাঠক ঃ পুষ্প রথে লয়ে সীতা যাইছে অম্বরে॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার॥

মাষ্টারদা ঃ যাও, এগিয়ে যাও ! [গণেশরা সাবধানে এগুতে থাকেন ।]

পাঠক ঃ শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে ।
প্রত্যক্ষ করিব স্বপ্ন একই দিবসে ॥

[পাহারাদার পুলিশটি বিপ্লবীদের দিকে পিছন ফিরতেই বিপ্লবীরা দ্রুত এগিয়ে যান ।]

হনুমান দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল ।
সীতা সম্ভাষিতে মোর এই বেলা হৈল ॥

গণেশ ঃ কাট অফ সেফটি !

টহলদার ঃ [আওয়াজ শুনে সতর্ক হন ।] হুকুমদার ?

গণেশ ঃ ফ্রেণ্ডস্ । [হঠাৎ গুলি করেন । টহলদার আর্তনাদ করে পড়ে যান ।] হটো-ভাগো-জান বাঁচাও—গান্ধীজিকা রাজ হো গয়া ! [প্রহরীরা বন্দুক ফেলে পালিয়ে যান । কেউ কেউ আহত হয়ে দৌড়ান । বিপ্লবীরা—ইনক্লাব, জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, বন্দে মাতরম—ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকেন । প্রতিধ্বনি করতে করতে মাষ্টারদা সদলে আসেন ।]

অনন্ত ঃ একটা মারা গেছে, আর তিনটে গুলি খেয়ে পালিয়েছে ।

গণেশ ঃ ভাঙ্গো অস্ত্রাগার ! [একদল অস্ত্রাগার ভাঙ্গতে শুরু করেন । অনন্ত সিং দ্রুত অন্য দলকে সাহায্য করবার জন্য চলে যান । অন্য পাঁচজন পাঁচটা টর্চ নিয়ে পাঁচ দিকে পাহারায় মোতায়েন হন । অস্ত্রাগার ভাঙ্গা হলে সকলে আনন্দে বন্দুক নিয়ে লোফা লুফি খেলতে থাকেন, ধ্বনি দিতে থাকেন ।] কম্পানী-ফল্-ইন্ ! [সকলে সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান । কয়েকজন সকলের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করেন ।] এখন যারা বন্দুক চালাতে জানেন না, তাড়াতাড়ি শিখে নিন ! [সকলে প্রস্তুত হন ।] দেখুন, প্রথমে এইভাবে ম্যাগাজিন খুলে টোটা

পুরে নিতে হবে। [টোটা পোরবার কায়দা দেখান।] এরপর এই ট্রিগারটিতে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে গুলি ছুটবে। এখন আমরা আকাশের দিকে একবার ফায়ার করব। লোড! [সকলে টোটা পোরেন।] এইম! [সকলে আকাশের দিকে লক্ষ্য স্থির করেন।] ফায়ার! [সকলের বন্দুক গর্জে ওঠে।]

মাষ্টারদা : বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক্ নামিয়ে ফেল! [কয়েকজন তাই করেন। নেপথ্যে গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া যায়।]

গণেশ : দাঁড়ান! আপনারা কারা?

নেপথ্যে : অনন্ত, গণেশ, আমি অম্বিকা।

সকলে : বন্দে মাতরম, ইনক্লাব—জিন্দাবাদ! [অম্বিকা চক্রবর্তীর দল প্রতিধ্বনি করতে করতে আসেন।]

মাষ্টারদা : টেলিফোন ভবন নিশ্চিহ্ন হয়েছে তো?

অম্বিকা : টেলিফোন ভবন এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

মাষ্টারদা : কেউ হতাহত হয়নি তো?

অম্বিকা : কেউ না।

মাষ্টারদা : খুব আনন্দ হচ্ছে! বিনা রক্তপাতে টেলিফোন ভবন ধ্বংস করার নজীর ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। [সকলে আনন্দে আলিঙ্গন করেন।]

উপেন : মাষ্টারদা, নামিয়ে এনেছি ইউনিয়ন জ্যাক্।

মাষ্টারদা : জ্বালিয়ে দাও! [ইউনিয়ন জ্যাকে আগুন ধরান হলে সকলে জয়ধ্বনি করতে থাকেন। নরেশের দল বিষন্নভাবে প্রবেশ করেন।] নরেশ, তোমরা একেবারে চুপচাপ কেন, কি হয়েছে?

নরেশ : মাষ্টারদা, বিপদ কিছু হয় নি—আমরা দৈহিকভাবে সকলেই সুস্থ, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি।

মাষ্টারদা : তোমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছ? —কেন? কিছুই বুঝতে

পারছি না—খুলে বল !

নরেশ ঃ সমস্তই প্ল্যান মত হয়েছিল মাষ্টারদা, কিন্তু ক্লাবে একজন সাহেবকেও পাওয়া গেল না। ক্লাব ঘর একেবারে শূন্য। বেয়ারা বাবুর্চিদের কাছে জানা গেল—সাহেবরা রাত আটটার মধ্যেই বাড়ী চলে গেছে।

মাষ্টারদা ঃ ঠিক আছে, ঐ নিয়ে তোমরা মন খারাপ কো'র না। চাঁটগা এখন আমাদের দখলে—পালাবে কোথায় !

বিধু ঃ মাষ্টারদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয় পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

মাষ্টারদা ঃ এখন জাতীয় পতাকা তোল !

[আলোর ইশারা।]

গণেশ ঃ কারা আসে ?

নেপথ্যে ঃ নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের পার্টি।

সকলে ঃ বন্দে মাতরম। [প্রতিধ্বনি করতে করতে নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং ও অন্যান্যরা আসেন। সকলে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, পরস্পরে আলিঙ্গন করেন।]

মাষ্টারদা ঃ সব ঠিক আছে তো ?

নির্মল ঃ সব ঠিক আছে মাষ্টারবাবু, এ এফ্ আই অস্ত্রাগারে আমাদের পূর্ণ বিজয় হয়েছে। মেজর ফ্যারল নিহত হয়েছে। ক্যাপ্টেন টেট্ এবং আর একজন অফিসার এগিয়ে এসেছিল, গুলি খেয়ে পালিয়েছে। আমাদের পক্ষে কোনও ক্ষতিই হয়নি, সকলেই সুস্থ আছে।

[সকলে জয়ধ্বনি করেন।]

অনন্ত ঃ কিন্তু মাষ্টারদা, আমাদের এই বিজয় গৌরব একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছে—এ এফ্ আই আর্মারীতে একটাও কার্তুজ পাওয়া যায় নি।

অম্বিকা ঃ সে কি ?

অনন্ত ঃ হ্যাঁ। রিভলবার, ম্যাগাজিন-রাইফেল, লুইস-গান অনেক পেয়েছি, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার—একটাও কার্তুজ নেই।

অম্বিকা ঃ আশ্চর্য !

মাষ্টারদা ঃ কি, একটাও কার্তুজ পাওনি ?

লোকনাথ ঃ একটাও না।

মাষ্টারদা ঃ তা কি করে সম্ভব ?

বিধু ঃ মাষ্টারদা, জাতীয় পতাকা লাগান হয়েছে। এবার ওঠাতে হবে। [মাষ্টারদা পতাকা তুলতে শুরু করেন। সকলে জয়ধ্বনি দেন। এমন সময় ওয়াটার ওয়ার্কসের দিক থেকে গুলি ছুটে আসে।]

গণেশ ঃ সকলে শুয়ে পড়ুন ! [সকলে শুয়ে প্রত্যুত্তর দেবার জন্য তৈরী হন।] ফায়ার ! ওয়াটার ওয়ার্কসের দিকে লক্ষ্য রেখে গুলি চালান ! ওরা লুইস গান চালাচ্ছে। চালাও গুলি ! কোন ভয় নেই—বন্দে মাতরম ! [সকলে প্রতিধ্বনি করেন এবং গুলি চালাতে থাকেন। প্রতিপক্ষের আওয়াজ থেমে যায়। একটু লক্ষ্য করে।] থেমে গেছে ওরা। তবু আর একবার গুলি চালান ! ফায়ার ! [সকলে গুলি চালান।] না, ওরা পালিয়ে গেছে। বন্দে মাতরম !

[সকলে—'পালিয়েছে, পালিয়েছে—বৃটিশ সিংহ নেড়ী কুত্তার মত লেজ তুলে পালিয়েছে, ইনক্লাব—জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, ইত্যাদি জয়োল্লাস প্রকাশ করেন।]

গণেশ ঃ কম্পানী ফল্ ইন ! [সকলে সারিবদ্ধ ও সৈনিকোচিত ভাবে দাঁড়ান। মাষ্টারদা পতাকা তোলেন—সকলে জয়ধ্বনি করেন।]

মাষ্টারদা ঃ প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ, আজ ভারতীয় বিপ্লবের গুরু-দায়িত্ব এই সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর উপর ন্যস্ত হয়েছে।

ভারতবাসীর অন্তরের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই মাত্র আমরা চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছি।

আজ বিশেষ আনন্দের এবং গৌরবের কথা এই যে; আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের সমস্ত ঘাটি ও অস্ত্রাগার দখল করেছে এবং বৃটিশ রাজত্বের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এর উপর এই মাত্র আমরা শত্রু বাহিনীকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করেছি। আজ চট্টগ্রামে অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত আর আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উর্দ্ধে উড্ডীয়মান। জীবন দিয়েই হোক, রক্তের বিনিময়েই হোক এই জয় এবং জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি, সূর্য সেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি :—এই বাহিনীর বর্তমান পরিষদই সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হল। আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করা, সমগ্র ভারতে এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রসারিত করা এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করার জন্য চট্টগ্রামের সমস্ত তরুণ-তরুণীদের এই সরকার আহ্বান জানাচ্ছে। বন্দে মাতরম! [সকলে প্রতিধ্বনি করেন।]

গণেশ : অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সম্মানে তিনবার গুলি চালান! [বিউগিল বেজে ওঠে।] লোড, এইম, ফায়ার! [তিন বার গুলি চালান হয়। মঞ্চের আলো কমে, পতাকাটি উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়—বিউগিলের আওয়াজ ভারতের জয় বার্তা ঘোষণা করতে থাকে।]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ সেই প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা আকাশে উড়েছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন বীরত্বে আর পূর্ণ মর্য্যদায়।

কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল ঃ—অস্ত্রাগার জ্বালাতে গিয়ে হিমাংশু সেন ভীষণ ভাবে অগ্নিদগ্ধ হলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে শহরে নিয়ে গেলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল। এর ফলে তাঁদের সঙ্গে মূল বাহিনীর যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়। সেই কারণে মাষ্টারদা তখনই শহরে প্রবেশ না করে বাহিনীকে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং পুনরায় যোগাযোগের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

[বঙ্গোপসাগরের মধ্যে নোঙ্গর করা একটা বৃটিশ জাহাজের ভিতর। চট্টগ্রামের জেলা কর্তা বেতার যন্ত্রে কথা বলছেন। ক্যাপ্টেন টেট্ তা লক্ষ্য করছেন। টেটের হাত ব্যাণ্ডেজ করা।]

জেলা কর্তা ঃ হ্যালো ক্যাল্‌কাট্টা···হ্যালো, হ্যালো ডি. এম চিটাগঙ্ বলছি—হ্যালো, হ্যাঁ-হ্যাঁ চিটাগঙ্—সি-সি—চায়না লিখতে সি লাগে। হ্যালো, টি-টি···হ্যালো, হ্যালো-হ্যালো, হ্যালো ক্যাল্‌কাট্টা ··

অপারেটর ঃ স্যার-স্যার, বোধহয় কেটে গেছে স্যার !

জেলা কর্তা ঃ অসম্ভব-অসম্ভব—সব শেষ হয়ে যাবে ! [যন্ত্র অপারেটারকে দেন।]

অপারেটর ঃ হ্যালো. হ্যালো, হ্যালো ক্যালকাট্টা, সি-দু'শ তিন, সি—দু'শ তিন, হ্যালো—

টেট্ ঃ আচ্ছা, ওরা কি বোমা ছুড়েছিল ?

জেলা কর্তা ঃ না-না বোমা কোথায়, ওরা আমাদের দিকে টর্চ মেরে জিজ্ঞেস করতেই আমি জিপ থেকে লাফ মেরে ক্যালভার্টের নীচে লুকিয়ে পড়েছিলাম।

অপারেটর ঃ স্যার ! [জেলা কর্তা দৌড়ে ধরতে যান।] ঐ যাঃ আবার কেটে গেল ! হ্যালো-হ্যালো, হ্যালো ক্যালকাট্টা হ্যালো !

জেলা কর্তা ঃ অপদার্থ, ঠিক ভাবে ধরে তবে ডাকবে !

টেট্ ঃ আচ্ছা, ওরা কত জন হবে বলে মনে করেন ? আমার তো মনে হয় খুব বেশী হলে, জনা পঞ্চাশেক হবে।

জেলা কর্তা ঃ কি জানি, পাঁচ'শও হতে পারে ! আমি অবশ্য শুধু দুখানি গাড়ীই দেখেছি। [জেলা কর্তার সহধর্মিণী শ্রীমতি লুইজী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আসেন।]

লুইজী ঃ ওঃ বব, আর দেরী করছ কেন—এখনও কি তোমার সখ মেটেনি, জাহাজ কি আর ছাড়বে না ?

জেলা কর্তা ঃ এই তো এক্ষুনি ছেড়ে দেব প্রিয়তমা। এখনও কিছু লোক এসে পৌঁছুতে পারেনি তো তাই একটু দেরী হচ্ছে।

অপারেটর ঃ হ্যালো-হ্যালো কলকাতা, হ্যালো, সি-দু'শ তিন, সি-দু'শ তিন হ্যালো—

লুইজী ঃ ক্যালকাট্টায় খবর পাঠাচ্ছ, সৈন্য পাঠাতে বলছ ? তার-মানে, তুমি হোমে ফিরে যাচ্ছ না ! বব্, আমি কিছুতেই এই নিগারদের দেশে আসতে চাইনি—আজ তোমার গোয়ার্তুমির জন্য এই মহাসাগরের বুকে আমাদের সকলের মৃত্যু হচ্ছে। ওগো, তুমি কি নিষ্ঠুর—একবার ডিক আর রিনের কথা ভাব ! ঐ নিষ্ঠুর নিগারগুলো ওদের খুন করবে, আমাকে বেইজ্জৎ করবে—এই কি তুমি চাও ?

জেলা কর্তা ঃ লুইজী, সোনামনি, আমার কথা শোন ! শোন, সত্যি আমরা হোমে ফিরে যাচ্ছি। শুধু যাবার আগে ক্যালকাট্টায় একটা খবর দেবার চেষ্টা করছি মাত্র। এই তুমি অন্য ঘরে গিয়ে চেষ্টা কর !

[অপারেটর তার যন্ত্র নিয়ে চলে যান।]

লুইজী : শোন লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু দয়া কর—ডিক আর রিনকে বাঁচতে দাও ! ঐ নিগারগুলো কাউকে রেহাই দেবে না, সবাইকে খুন করবে।

জেলা কর্তা লুইজী শোন, লুইজী—

লুইজী : ওগো তুমি চাকরী ছেড়ে দাও, এ চাকরী তোমার দরকার নেই !

জেলা কর্তা : লুইজী, বিশ্বাস কর—আমি এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দেব !

লুইজী : না তুমি ছাড়বে না। আমি জানি—তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

জেলা কর্তা : ওঃ ! টেট্ এঁকে একটু বোঝান না !

টেট্ : মিসেস্ দয়া করে একটু ধৈর্য্য ধরুন ! আমাদের কথা বিশ্বাস করুন—আমরা নিশ্চয় নিরাপদে হোমে ফিরে যাব !

লুইজী : মিথ্যে কথা ! তা যদি হত তবে এতক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হত।

টেট্ : না-না, মিসেস্, আপনি অহেতুক এত বেশী উত্তেজিত হচ্ছেন। আসলে আরও কিছু আমাদের লোক শহরে রয়ে গিয়েছে—তারা এসে গেলেই আমরা জাহাজ ছেড়ে দেব।

লুইজী : আপনি বলতে চান—কোন উত্তেজনার কারণ নেই ?

টেট্ : নিশ্চয় আছে। তবে আপনি যতটা ভাবছেন ততটা নয়। কেননা ; আমরা সমুদ্রের ভিতরে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছি, যথেষ্ট অস্ত্র সস্ত্র রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তাছাড়া ঐ নিগারগুলোকে অতটা ভয় পাবারও কিছু নেই। দেখলেন না ; আপনার স্বামী এবং আমি ওদের মুখোমুখি পড়েও বেঁচে এসেছি। [জেলা কর্তাকে] আচ্ছা, আপনার সঙ্গে তখন বডিগার্ড ছিল না ?

জেলা কর্তা ঃ ছিল, সেই তো প্রথম গুলিতে মারা গেছে। তারপর জিপ ড্রাইভার—

লুইজী ঃ ওঃ হাব্বিব ! [কেঁদে স্বামীর কাঁধে ঢলে পড়েন।]

জেলা কর্তা ঃ লুইজী, লুইজী একটু শান্ত হও! [টেট্‌কে] হাব্বিব হচ্ছে ঐ জীপ ড্রাইভারটির নাম। লুইজী তাকে ভীষণ ভালবাসতো—মানে স্নেহ করত তো! [লুইজীর কান্না সপ্তমে চড়ে।] লুইজী, লুইজী, দয়া করে নিজেকে একটু সামলাও !

[একজন সার্জেন্ট পুলিশ অস্ত্রাগারে পাঠরত সেপাইটিকে ধরে নিয়ে আসে।]

সার্জেন্ট : একে আপনার কাছে নিয়ে এলুম স্যার।

লুইজী ঃ [আৎকে ওঠেন।] এ কে, একি তাদেরই একজন ?

জেলা কর্তা : কে এ ?

সার্জেন্ট ঃ স্যার, পুলিশ অস্ত্রাগারে যারা পাহারায় ছিল তাদেরই একজন।

জেলা কর্তা ঃ ওঃ, কি নাম তোমার ?

সেপাই ঃ অনিল পরামাণিক, স্যার।

জেলা কর্তা ঃ কতদিন চাকরী করছ তুমি ?

সেপাই ঃ আজ্ঞে আঠাশ বছর !

জেলা কর্তা ঃ [বিস্ময়ে] আঠাশ বছর ! তুমি কি দেখেছ বল।

সেপাই : আজ্ঞে—তখন তো আমরা পাঁচজন পাহারা দিচ্ছি—

টেট্ ঃ [ধম্‌কে] পাহারা দিচ্ছিলে না ঘুমুচ্ছিলে ?

সেপাই ঃ আজ্ঞে না—পাহারাই দিচ্ছিলাম।

টেট্ ঃ ঠিক আছে বল !

সেপাই ঃ আজ্ঞে বলছি—আমরা তো পাহারা দিচ্ছি, হঠাৎ তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে হাজির।

জেলা কর্তা ঃ তারা কতজন হবে ?

সেপাই : আজ্ঞে হাজার-হাজার।

জেলা কর্তা :
টেট্ : } হাজার হাজার !!

লুইজী : ওঃ বব্ !

জেলা কর্তা : লুইজী, শান্ত হও—শান্ত হও! [সেপাইকে] কি বল্লে—হাজার হাজার ?

সেপাই : আজ্ঞে হ্যাঁ, কয়েক হাজার তো বটেই। চারিদিক থেকে শুধু কাতারে-কাতারে লোক আসছে আর আসছে। মানে —এদিক থেকে শুনছি বন্দে মাতরম বলতে বলতে আসছে —হঠাৎ দেখি ওদিক থেকেও আসছে। তারপর দেখছি অন্য দিক থেকেও আসছে। শেষে দেখি সবদিক থেকে শুধু আওয়াজ আর আওয়াজ—বন্দে মাতরম আর বন্দে মাতরম—

জেলা কর্তা : শাট্ আপ ! বন্দে মাতরম ! আচ্ছা টেট্, এরাও কি গান্ধীর শিষ্য ?

টেট্ : পুরোপুরি তা নয় বোধহয়—

সেপাই : আজ্ঞে না, এরা গান্ধীরই শিষ্য। নৈলে 'গান্ধীজীকা রাজ হো গয়া'- বলে চিৎকার করবে কেন ?

টেট্ : যাকগে-যাগকে, তারপর কি হল, তাই বল !

সেপাই : কি আর বলব হুজুর—অন্ধকারে তাদের তো বোঝা যাচ্ছিল না—তা ছাড়া তারা আবার আমাদের মত পোষাক—

জেলা কর্তা : [চমকে] মানে পুলিশের মত পোষাক ?

সেপাই : আজ্ঞে হাঁ। হুজুর।

জেলা কর্তা : না কি—পুলিশেরাই এই বিদ্রোহ করেছে ?

সেপাই : না হুজুর।

জেলা কর্তা : চুপ কর। টেট্, এটা পুলিশ বিদ্রোহ নয় তো ? তোমার কি মনে হয়, দেশী পুলিশেরা এখন কোথায় ?

টেট্ : ঠিক ভাবে কোন কিছুই বলা সম্ভব নয়, তবে সম্ভবতঃ প্রাণ ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

জেলা কর্তা : গা ঢাকা দিয়েছে, না বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে? সার্জেণ্ট, তোমার কি মনে হয়?

সার্জেণ্ট : আজ্ঞে স্যার কিছুই ঠিক করে বলা যাচ্ছে না—

জেলা কর্তা : বিদ্রোহ-বিদ্রোহ, নির্ঘাৎ বিদ্রোহ। টেট্, আমাদের আঠার'শ সাতান্নর সিপয় মিউটিনীর কথা ভুললে চলবে না।

লুইজী : সেই কথাই তো আমি বলছিলাম—এই সিপয়টাও বোধহয় ওদেরই দলে।

জেলা কর্তা : তা যদি হয়—গুলি করে ফেলে দেব সাগরের জলে।

সেপাই : ওরে বাপরে! হুজুর—মা-বাপ, আমাকে প্রাণে মারবেন না হুজুর। আমি কোন দোষ করিনি হুজুর—ওরাই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলছিল হুজুর—কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে এসেছি হুজুর! এই নাক খৎ খাচ্চি হুজুর—দয়া করুন হুজুর! আপনি আমার বাবার বাবা হুজুর—এই যে আপনার পায়ে পড়ছি হুজুর!

[পা জড়িয়ে ধরে।]

জেলা কর্তা : [ঝটকা দিয়ে পা ছাড়িয়ে নেন।] চুপ কর! [বাইরে—'ঐ ওরা আসছে'—ইত্যাদি বলে ভয়ার্ত চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যায়।] কিসের গোলমাল? [সার্জেণ্ট বেরিয়ে যান।] টেট্ কারা আসছে?

টেট্ : কিছু তো বুঝতে পারছি না। [সার্জেণ্ট আসেন।]

সার্জেণ্ট : স্যার, কয়েকটা সাম্পান আসছে।

জেলা কর্তা : এঁ্যা!

সার্জেণ্ট : হ্যাঁ স্যার। আমাদের জাহাজের সবাই ভাবছে—ডেকয়েটরাই আমাদের হত্যা করতে আসছে।

লুইজী : নাঃ! ওঃ বব্, এইভাবে নিগারদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে

মরাই বুঝি আমার ভাগ্যে ছিল !

জেলা কর্তা : টেট্, টেট্ কি করব আমি ?

টেট্ : [রিভলবার বের ক'রে] আমি দেখছি স্যার। [বেরিয়ে যান।]

জেলা কর্তা : [সাজেণ্ট ও অন্যদের প্রতি] যাও, বাইরে গিয়ে দেখ কারা আসছে ! [সাজেণ্ট ও অন্যরা চলে যান।] লুইজী, প্রিয়তমা, এই দেখ, আমার কাছে এখনও এই রিভলবারটা আছে। আমি থাকতে তুমি এত—

[বাইরে গুলির আওয়াজ।]

লুইজী : আমাকে—আমাকে গুলি কর বব, আমাকে গুলি কর ! ওঃ, কখন থেকে তোমাকে বলছি; জাহাজ ছেড়ে দাও—হায় ! যাকগে, তুমি এখনই আমাকে গুলি কর—ঐ নিগারদের হাতে বেইজ্জৎ হবার আগে আমাকে মেরে ফেল !

জেলা কর্তা : দয়া কর, দয়া করে চুপ কর ! [সার্জেণ্ট আসেন।]

সার্জেণ্ট : স্যার, ওরা আমাদের লোক।

জেলা কর্তা : এঁ্যা।

সাজেণ্ট : হ্যাঁ স্যার, ফায়ারিং-এর উত্তরে ওরা ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়িয়েছে, আর এখন অনেক কাছে তো—অনেকটা চেনাও যাচ্ছে। ওরা আমাদেরই লোক।

জেলা কর্তা : যাও, যাও—ওদের সাহায্য কর গিয়ে। [সাজেণ্ট চলে যান।] লুইজী দেখলে তো—ওরা আমাদেরই লোক ! তুমি বোঝ না— বৃটানীয়া কোন দিন শেষ হতে পারে না। সারা দুনিয়াকে চিরকালই তার পদতলে বাস করতে হবে—এই ঈশ্বরের বিধান। লুইজী, প্রিয়তমা !

লুইজী : ওঃ বব, কি যে ভয় পেয়েছিলাম ! আমার জন্য নয়, ডিক আর রিনের জন্য। ওরা তো পৃথিবীর কিছুই ভোগ করতে পারেনি—ওদের জন্য হঠাৎ মাথার মধ্যে কেমন হয়ে

গিয়েছিল। [সার্জেণ্ট আসেন।]

সার্জেণ্ট : স্যার, শহরের সমস্ত বৃটিশার্স এসে গেছেন।

জেলা কর্তা : বেশ।

সার্জেণ্ট : তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছেন—এক্ষুনি হোমে ফিরে যেতে চান। [টেট্ মিসেস্ ফ্যারলকে নিয়ে আসেন।]

টেট্ : স্যার, মিসেস্ ফ্যারল।

জেলা কর্তা : ফ্যারল ?

টেট্ : স্যার, এ, এফ, আই, অস্ত্রাগারের সাজেণ্ট মিষ্টার ফ্যারল—তাঁর স্ত্রী।

জেলা কর্তা : ওঃ হো, আসুন, আসুন ! মিসেস ফ্যারল, আপনার এই দারুণ শোকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার নেই—

ফ্যারল : ওঃ স্যার—[ড্ুকরে কেঁদে ওঠেন।]

জেলা কর্তা : মিসেস ফ্যারল, আপনার স্বামী মহান বৃটানীয়ার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন—তিনি অমর। আমাদের মহান সম্রাট নিশ্চয় আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতির ক্ষতি-পূরণ দেবেন। আর আপনার উপর যে অসম্মান, জবরদস্তি অর্থাৎ আপনার নারীত্বের যে অপমান হয়েছে—

লুইজী : থাক-থাক, ও কথা আর বারবার মনে করিয়ে দিও না, আহাঃ বাছা ! [ফ্যারলের পিঠে হাত বুলিয়ে] তারা কতজন ছিল বাছা ?

ফ্যারল : এ্যাঁ !

জেলা কর্তা : হ্যাঁ-হ্যাঁ, তারা কতজন—মানে ঐ নিগার ডেকয়েট-গুলো কতজন ছিল ?

ফ্যারল : তাতো আমি জানি না।

লুইজী : সেকি বাছা, তুমি জান না তারা কতজন ছিল !

ফ্যারল : কি করে জানব--আমি তো ঘরের মধ্যে ছিলাম, আর তারা বাইরে।

লুইজী : বাইরে ?

ক্যারল : হ্যাঁ বাইরে—মানে অস্ত্রাগারে। আমার স্বামীই তো 'কে, কে ওখানে'—বলতে বলতে বাইরে গিয়েছিলেন। নৈলে তো—

লুইজী : মানে তুমি বলছ—তারা তোমার কাছে আসেনি ?

জেলা কর্তা : মানে ?

টেট্ : আপনি বলতে চাইছেন—তারা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি ? না-না আপনি লুকাবেন না—সব আমাদের জানা দরকার !

জেলা কর্তা : ঠিক, আপনি কোন কথা বলতে লজ্জা পাবেন না।

লুইজী : হ্যাঁ হ্যাঁ বল বাছা—এসব তো ওঁর সরকারী নথিতে রাখতে হবে।

টেট্ : আপনি বলুন—প্রত্যেকটাকে আমরা ধরে ধরে শাস্তি দেব। আপনি কি ওদের চিনতে পারবেন ?

ক্যারল : নাঃ, কি করে চিনব ?

লুইজী : কেন ?

জেলা কর্তা : কিন্তু মিসেস ক্যারল, আপনাকে ধর্ষণ করা শুধুমাত্র আপনার একার অপমান নয়, সমগ্র বৃটিশ জাতির লজ্জা। সুতরাং অপনি চুপ করে থাকতে পারেন না, কারণ সমগ্র বৃটিশ জাতির সম্মান রক্ষা করতে এদের শাস্তি দিতেই হবে।

ক্যারল : কেন এক কথা বার বার জিজ্ঞেস করছেন আমাকে ? আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, এ সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, যারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে তাদেরই প্রশংসা করতে হয় !

লুইজী : মানে ?

জেলা কর্তা : অর্থাৎ

টেট্ : কেন, কেন—প্রশংসা করতে হবে কেন ?

ফ্যারল : আমি ঘর থেকে বেরুতে গেলে ওরা আমাকে বলেছিল—বোন আপনি বাইরে আসবেন না, যেমন আছেন তেমনি থাকুন·· নারী এবং শিশু আমাদের শত্রু নয়। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী !

জেলা কর্তা : কি !

টেট্ : এর মানে কি ?

লুইজী : কি, বলছ কি !

ফ্যারল : ওরা তো ওঁকে বাইরে যেতে মানা করেছিল। আমিও কত করে নিষেধ করেছিলাম ··টম্ যেওনা টম্। কিন্তু কিছুতেই কথা শুনল না। [কেঁদে ফেলেন।]

জেলা কর্তা : [টেট্‌কে] এও কি সম্ভব ? [পায়চারী ক'রে] আচ্ছা, তারা কি এখনও শহরে ?

টেট্ : না, এদের কাছেই খবর পাওয়া গেল·· তারা শহরে নেই। সম্ভবতঃ কোন পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

জেলা কর্তা : পাহাড়ে, কোন পাহাড়ে ?

টেট্ : ঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে ফতেয়াবাদ কিংবা জালালাবাদের পাহাড়ে হতে পারে।

জেলা কর্তা : জালালাবাদ···জালালাবাদ ! [চিন্তিত]

—দৃশ্যান্তর—

(জালালাবাদ পাহাড়। ২২শে এপ্রিল। বিপ্লবীরা নজরুলের 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' গানটি গাইছেন। নির্মল সেন, মাষ্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী একদিকে পরামর্শ করছেন।)

অম্বিকা : (গান শেষ হলে) বোধহয় তিনটে বাজে।

মাষ্টারদা : বোধহয়।

নির্মল : অনেক দেরী হয়ে গেল ! এখন যদি তিনটে বেজে থাকে, তবে আমাদের বিদ্রোহ শুরু হয়েছে মোট তিন দিন পনের ঘণ্টা ।

অম্বিকা : কিন্তু এখনও আমরা শহরে ঢুকতে পারলাম না, এটা খুবই বিপদের কথা !

মাষ্টারদা : হুঁ !

টেগরা : হুঁ, শহরেও ঢোকা হচ্ছে না, আর খাবারও পাওয়া যাচ্ছে না ।

বিধু : সত্যি, শহরে ঢুকতে এত দেরী হচ্ছে আমাদের ।

লোকনাথ : আরে, অনন্তদা, গণেশদা ওঁদের জন্যই তো অপেক্ষা করলাম দুইদিন ।

রজত : যা ও বা অমরেন্দ্রকে পাঠান হল ওদের খোঁজ করতে, তারও কোন খবর নেই ।

বিধু : আচ্ছা, অনন্তদারা নাকি মাষ্টারদাকে না বলেই চলে গেছে ?

লোকনাথ : হুঁ ।

রজত : অথচ গণেশদা স্বয়ং যুদ্ধের সেনাপতি ।

বিধু : এ'ত ভীষণ অন্যায় !

লোকনাথ : যাক্‌গে ও নিয়ে কোন আলোচনা চলবে না ।

দেবু : (পাহারা দিচ্ছিলেন) মাষ্টারদা, দু'টো লোক পাহাড়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে ।

মাষ্টারদা : কে, কোথায় ?

দেবু : (মাষ্টারদাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে দেখান ।) ঐ যে ··চলে যাচ্ছে ।

(মাষ্টারদা চিন্তিতভাবে ফিরে আসেন ।)

অম্বিকা : কি মাষ্টারবাবু ?

মাষ্টারদা : লোক দু'টোর ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক ।

অম্বিকা : স্পাই ?

মাষ্টারদা ঃ হতেও পারে।

লোকনাথ ঃ কিন্তু সন্ধ্যা হতে তো আর দেরী নেই—ওরা ফোর্স নিয়ে আসার আগেই আমরা শহরে ঢুকে পড়তে পারব।

নির্মল ঃ সে কথা ঠিক।

[নরেশ সকলকে কাঁচা আম বিতরণ করেন।]

মাষ্টারদা ঃ কি ?

নরেশ ঃ কাল ফতেয়াবাদ পাহাড়ের গাছ থেকে পেড়ে কাঁচা আম খেয়েছিলাম না, তার কয়েকটা রেখে দিয়েছিলাম। এ চারদিন তো কাঁচা আম, কাঁচা কুমড়ো খেয়েই কাটল।

[সকলে কাঁচা আম খাচ্ছেন। একজন বিপ্লবী 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—গানটি গাইতে থাকেন।]

অম্বিকা ঃ কি ভাবছেন ?

মাষ্টারদা ঃ ঠিক বুঝতে পারছি না—মনে হচ্ছে কোন বিপদ আসন্ন !

অম্বিকা ঃ ঐ লোক দু'টোর জন্য ?

মাষ্টারদা ঃ হ্যাঁ।

নির্মল ঃ কিন্তু আমরা তো অন্ধকার হলেই শহরে ঢুকে পড়ছি—এর মধ্যে ওরা এসে পড়তে পারবে না।

টেগরা ঃ মাষ্টারদা, মাষ্টারদা, পাহাড়ের নিচে একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে গেল !

সকলে ঃ অ্যাঁঃ !

অম্বিকা ঃ বোধ হয় বাইরে থেকে ফৌজ এনে ফেলেছে।

নির্মল ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো ফৌজ নামছে।

মাষ্টারদা ঃ লোকনাথ ! এদিকে এস, সকলে শুনুন—লোকনাথই আজকের সেনাপতি ! বন্ধুগণ, আজ জেনারেল বলের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী গুণ্ডাদের একেবারে পর্যুদস্ত করে দিন।

লোকনাথ ঃ কম্পানী-ফল্ ইন ! [সকলে সামরিক কায়দায় দাঁড়ান।] বন্ধুগণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে কুত্তা গুলোকে

আজ সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। সকলে অস্ত্র প্রস্তুত ক'রে শুয়ে তৈরী হোন। [সকলে শায়িত ভঙ্গীতে নিচের দিক থেকে অগ্রসর সৈন্য বাহিনীর দিকে বন্দুক তাক করেন।] আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ গুলি চালাবেন না।

নির্মল ঃ ঐ, ওরা উঠে আসছে।

লোকনাথ ঃ কৈ, দেখতে পাচ্ছি না তো ?

নির্মল ঃ ঐ তো—খাকি রঙের পোষাক জমির সবুজ রঙের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে—ঐ যে, পিঁপড়ে সারির মত দেখা যাচ্ছে।

অম্বিকা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুইদিক থেকে দু'সারি।

লোকনাথ ঃ চালাও গুলি ! বন্দে মাতরম্ !

[সকলে গুলি চালান।]

টেগরা ঃ দাদা, অনেকগুলো ঘায়েল হয়েছে দাদা !

রজত ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, পালাচ্ছে—ওরা পালাচ্ছে !

লোকনাথ ঃ চালাও গুলি ! বন্দে মাতরম্ ! [সকলে প্রতিধ্বনি করেন, গুলি চালান।] থামুন ! [ভাল করে লক্ষ্য ক'রে] কোথায় গেল ?

অম্বিকা ঃ মনে হচ্ছে—ঐ খাদের মধ্যে লুকিয়েছে।

লোকনাথ ঃ আমাদের কেউ জখম হয়েছে কি ?

মাষ্টারদা ঃ না।

লোকনাথ ঃ বন্দে মাতরম্ ! [সকলে প্রতিধ্বনি করেন।]

বিধু ঃ লোকাদা, আমার বন্দুকটা বন্ধ হয়ে গেছে—ফায়ার হচ্ছে না।

নির্মল ঃ দেখি ! [বিধু রাইফেলটা এগিয়ে দেন।] ওঃ, একটু পরিষ্কার করে তেল দিলেই আবার চলবে।

লোকনাথ ঃ ভাইসব, ওরা খাদে লুকিয়েছে—সকলে খুব সতর্ক

থাকুন ! [সকলে শায়িত অবস্থায় পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে থাকেন। হঠাৎ উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি ছুটে আসে।]

নির্মল ঃ সাবধান, ওরা উত্তর আর দক্ষিণ পাহাড়ের উপর থেকে মেসিনগান চালাচ্ছে।

লোকনাথ ঃ উত্তর আর দক্ষিণের পাহাড় লক্ষ্য করে গুলি চালান ! বন্দে মাতরম্ ! [যুগপৎ গুলি ও ধ্বনি চলতে থাকে।]

নরেশ : দাদা, আমার রাইফেলটা বন্ধ হয়ে গেছে।

নির্মল ঃ রাইফেলটা আমার কাছে পাঠাতে পারলে ঠিক করা যেত।

মাষ্টারদা ঃ দাঁড়ান ! [গড়িয়ে গড়িয়ে নরেশের রাইফেল নির্মল সেনের কাছে এনে দেন।] এই যে।

টেগরা ঃ যাঃ শালা ! [গুলি চালান।] মর্ ! [আনন্দে উঁচু হয়ে গুলি চালান। তিন নম্বর তুই ! [গুলি চালান।] খতম হবি তুইও ! [উল্লাসে গুলি চালাতে চালাতে দাঁড়িয়ে পড়েন। তার বুকে এসে একটি গুলি লাগে।] আঃ ! [লোকনাথকে] আঃ—সোনা ভাই, আমি চল্লাম, তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও—থেমে যেওনা ! বন্দে মাতরম্ ! [লুটিয়ে পড়েন, ছট্‌ফট্ করতে থাকেন।]

নরেশ ঃ লোকাদা, টেগরা !

লোকনাথ : [মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহের ভাইয়ের মৃত্যু যন্ত্রণায় থমকে যান।] যাও ভাই, বিপ্লবীর মত মৃত্যু বরণ কর ! বন্দে মাতরম্ !

[টেগরা প্রতিধ্বনি করতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় গুলি তাঁকে স্তব্ধ করে দেয়। লোকনাথ মুহূর্ত্তকাল নিরব থেকে আবার যুদ্ধ শুরু করেন। সকলে গুলি চালান ও ধ্বনি দিতে থাকেন। মাষ্টারদা নরেশের রাইফেল সারান হলে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। শত্রু

ঘায়েল হলে—'মরেছে, মরেছে আর এক শালা মরেছে'—বলে বিপ্লবীরা উল্লাস প্রকাশ করতে থাকেন এবং প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করতে থাকেন। মাষ্টারদা আগের মত রাইফেল সারান ও পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করতে থাকেন। বিপ্লবীদের মধ্যে গুলি লাগে নির্মল লালা, প্রভাস বল, পুলিন ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জিতেন দাশগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কানুনগো, অর্ধেন্দু দস্তিদার, বিনোদ দত্ত, বিনোদ চৌধুরী ও অম্বিকা চক্রবর্তীর গায়ে।] থামুন! অন্ধকার হয়ে গেছে, ওরা গুলি চালান বন্ধ করেছে—এখন চুপ করে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে। [সকলে তাই করেন। হঠাৎ ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়।]

মাষ্টারদা : ঐ শুনুন! [ট্রেন ছাড়ার আওয়াজ শোনা যায়।]

নির্মল : ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে—ওরা বোধহয় পালাচ্ছে।

রজত : হ্যাঁ হ্যাঁ, পালাচ্ছে, ভাড়াটে গুণ্ডারা পালাচ্ছে।

লোকনাথ : নিশ্চয় ওরা পালিয়েছে। নৈলে কিছুতেই ট্রেন ছেড়ে দিত না।

রজত : পালিয়েছে, পালিয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী কুত্তারা লেজ তুলে পালিয়েছে—বন্দে মাতরম্!

[সকলে প্রতিধ্বনি করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন।]

লোকনাথ : কম্পানী-ফল্ ইন! [সকলে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ান। মাষ্টারদা আহত ও মৃতদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাঁদের নাম ধরে ডাকতে থাকেন—বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁরা আছেন কি না।]

মাষ্টারদা : অম্বিকাবাবু, অম্বিকাবাবু! [অম্বিকা একটু নড়ে উঠলে দেখা যায়—তাঁর ঠিক ভ্রুর মধ্যস্থানে গুলির আঘাত। [উচ্চ স্বরে] অম্বিকাবাবু, অম্বিকাবাবু, আমাদের জয়

হয়েছে অম্বিকাবাবু। বৃটিশ বাহিনী হেরে পালিয়ে গেছে। অম্বিকাবাবু, উঠুন! একটু চেষ্টা করুন—আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন! আমরা আপনাকে নিয়ে যাব—উঠুন!

অম্বিকা : [অতি কষ্টে] আমি যেতে পারব না—আপনারা চলে যান!

মাষ্টারদা : বিনোদ দত্ত আর বিনোদ চৌধুরীর আঘাত কম, ওদের নিয়ে যেতে হবে। প্রিয় সৈনিকবৃন্দ! আজ ২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, জালালাবাদের পাহাড়ে আমরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি—শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি এবং জয়লাভ করেছি। আজ আমাদের বারজন সাথী তাঁদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এই জালালাবাদ পাহাড়কে এক মহাতীর্থে পরিণত করলেন। তাঁদের অমর স্মৃতি আমাদের বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা থাক। [অম্বিকাকে নড়তে দেখে] কিছু বলবেন? [অম্বিকার কাছে ছুটে যান।] অম্বিকা-বাবু, বলুন অম্বিকাবাবু, এই যে আমি।

অম্বিকা : সূর্যবাবু, [পকেট থেকে কিছু টাকা ও কাগজপত্র বের করে দেন।] এই টাকা আর দরকারী কাগজপত্রগুলি নিন আর আপনারা তাড়াতাড়ি চলে যান।

মাষ্টারদা : আপনাকে আমরা নিয়ে যাব অম্বিকাবাবু।

অম্বিকা : সূর্যবাবু, সময় নষ্ট করবেন না—সবাইকে নিয়ে চলে যান!

মাষ্টারদা : সকলে অস্ত্র তুলে নাও! [সকলে তাই করে।] এখন আমরা গ্রামের দিকে নেমে যাব। অম্বিকাবাবু, এই রিভলবারটা রাখুন, যতক্ষণ পারবেন আত্মরক্ষা করবেন।

অম্বিকা : ধন্যবাদ সূর্যবাবু, এই রিভলবারের শেষ গুলিটি আর চেতনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা সাম্রাজ্যবাদী কুত্তাকেও ছেড়ে দেব না—জানবেন। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক, বিদায়!

মাষ্টারদা ঃ [শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে] হে জালালাবাদের অমর শহীদবৃন্দ, বিদায় ! বন্দে মাতরম্, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক ! [হাত নেড়ে বিদায় নেন। অম্বিকাবাবু ও হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দেন।]

লোকনাথ ঃ কম্পানী-মার্চ অন্ ! [সৈনিকের ভঙ্গীতে মার্চ করতে করতে অম্বিকাবাবুর কাছে এসে] অম্বিকাদা, বিদায় ! বন্দে মাতরম্ !

অম্বিকা ঃ [ক্ষীণ কণ্ঠে] বন্দে মাতরম্ !

[অনুরূপ ভাবে সকল সৈনিকবৃন্দ অম্বিকাবাবুকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে যান। অম্বিকাবাবু তাদের প্রত্যুত্তর দেন এবং সকলে চলে গেলে রিভলবারটি শত্রুর দিকে লক্ষ্য স্থির করে অপেক্ষা করতে থাকেন।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

সূত্রধার ঃ সারা ভারত কেঁপে উঠল। ভারতের পূর্ব প্রান্ত চট্টগ্রামে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল, তা সারা ভারতের হৃদয় স্পন্দিত, মথিত, উত্তাল করে তুলল। ভারত সরকারও বসে থাকল না। সাধারণ মানুষের উপর শুরু হল বর্বর অত্যাচার।

[চট্টগ্রামের কোন গলিপথ। সন্ধ্যা বেলা। আসানউল্লা ও কয়েকজন পুলিশ আসেন।]

আসান ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ—আরে, আমি আসানউল্লা, সব ঠাণ্ডা করে দেব। বরিশালের বিপ্লব ঠাণ্ডা করে এসেছি। এবার দেখবে—চাটগাঁর বিপ্লবও ঠাণ্ডা—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

১ম পুলিশ ঃ সত্যি স্যার, আপনার ক্ষমতা দেখে আমরা একেবারে অবাক হয়ে যাই।

২য় পুলিশ ঃ তা ঠিক। সেই দিন, সেই দশ বারটা ছোকরাকে স্যার যে ভাবে পেটালেন—বাবার জন্মে অমন মার দেখিনি স্যার। আর যখন আপনি—"সূর্য সেন কোথায়, সূর্য সেন কোথায়"—বলে হুমকি দিচ্ছিলেন—আপনার সে মূর্তির কথা ভাবলে, আমার এখনও বুকটা হুরু হুরু করে স্যার।

আসান ঃ কেন-কেন ?

২য় পুলিশ ঃ না—মানে—আমাদের তো আর আপনার মত সাহস নেই—মানে—ওরা যদি সত্যি সত্যি সূর্য সেনের দলের লোক হত।

আসান ঃ তাতে কি, আমি কি ওদের ভয় করি নাকি ? আরে ক'টা মাস যেতে দাও—শুয়োরের বাচ্চাদের হিঁদুয়ানী

ছুটিয়ে দেব একেবারে ! বুঝলে—রায় বাহাদুর আসানউল্লা চাটগাঁয় এসেছে, বন্দে মাতরম্ এখন কোন দিক থেকে বেরয় দেখতে পাবে।

১ম পুলিশ : সত্যি স্যার, আপনার ক্ষমতা অসাধারণ।

আসান : আরে বাবা, সরকার কি আমাকে মুখ দেখে খান বাহাদুর উপাধি দিয়েছে ?

২য় পুলিশ : সত্যি—সে দিন সেই আসামীটাকে স্যার যা করলেন !

১ম পুলিশ : কি কি ?

২য় পুলিশ : আরে সেই যে, অম্বিকা চক্রবর্তী—সূর্য সেনের ডান হাত—

১ম পুলিশ : কি, কি করেছিলেন ?

২য় পুলিশ : জান না ? পেটানীর চোটে যখন জল জল—করে কাৎরাচ্ছিল, স্যার তো তার মুখে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল !

১ম পুলিশ : তাই নাকি ? [সকলে উল্লাসের হাসি হাসতে থাকেন। নেপথ্য থেকে কিশোরী কণ্ঠে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি শোনা যায়।]

আসান : [গর্জন করে] শালা, শুওরের বাচ্চা, কুত্তি; আবার হিঁদুয়ানী ! চল, চল, সব শেষ করে দেব একেবারে ! [দৌড়ে বেরিয়ে যান। পুলিশরাও পিছন পিছন যান। নেপথ্যে—'আগুন, আগুন'—চিৎকার, আর্তনাদ, মার-ধরের আওয়াজ শোনা যায়। একটি কিশোরীকে টেনে হিচড়ে পুনরায় আসেন। [বল হারামজাদী—আর গাইবী ঐ গান ?

কিশোরী : গাইব—এক'শ বার গাইব।

আসান : তবে রে ! [কিশোরীকে আঘাত করেন। কিশোরীটি আঘাতে লুটিয়ে পড়েন এবং গান গাইতে শুরু করেন— 'কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান।' প্রচণ্ড রাগে তাকে

আরও আঘাত করেন।] গা, আরও গান কর! কৈ, আর গাইবি না? [রক্তাক্ত মেয়েটি একটু একটু করে মাথা তুলে আবার গাইতে শুরু করেন—'কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।' কিশোরীর এই মনোবল দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। মেয়েটি গাইছে —'এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।' ক্ষিপ্ত হয়ে কিশোরীর মাথায় গুলি করেন।] মর-মর-মর! [মেয়েটির ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখে বীভৎস হাসতে থাকেন। পুলিশ দুইজন ফিরে আসেন।]

১ম পুলিশ : মেয়েটার বাড়ীর সবগুলোকে পিটিয়ে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছি।

২য় পুলিশ : দেখ, দেখ, বাড়ীটাতে আগুনটা এবার জোর ধরেছে—কেমন আলোয় আলো হয়ে গিয়েছে!

১ম পুলিশ : হ্যাঁ, দারুণ দেখাচ্ছে।

২য় পুলিশ : আচ্ছা, সেই মেয়েটা কোথায়?

১ম পুলিশ : বোধহয় শেষ। আসানউল্লার হাতে কি আর রেহাই পাবে!

আসান : না, আমার হাতে কারও রেহাই নেই। ঐ হিঁদুয়ানীর দফারফা করে তবে আমি রেহাই দেব। বরিশালের বিপ্লব ঠাণ্ডা করে এসেছি, এবার চাট্গাঁ ঠাণ্ডা করব, তবে আমার নাম—খান বাহাদুর আসানউল্লা খান।

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার : চলল অত্যাচার। সরকার হিন্দু জনসাধারণের কাছ থেকে 'পিটুনী কর' আদায় করতে লাগলেন। অর্থাৎ—বিপ্লব প্রতিরোধে পুলিশ ও মিলিটারীর পেছনে যে

অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছিল, তা দিতে হল হিন্দু জনসাধারণকে, আর মুসলমানরা এই কর থেকে পেলেন রেহাই। অন্যদিকে ভাইসরয় লর্ড আরুইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটা নতুন চুক্তি হল। সেই চুক্তির ফলে অহিংস-অসহযোগী আন্দোলনের সমস্ত বন্দীরা মুক্ত হলেন। কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলনকারীরা ছাড়া পেলেন না। এই ঘটনায় জনসাধারণ ও ছাত্রদের মনে মহাত্মা গান্ধী ও যতীন্দ্র মোহনের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল।

[১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ছাত্র সম্মেলন। ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বক্তৃতা মঞ্চে যতীন্দ্রমোহন।]

যতীন্দ্র : বন্ধুগণ, আমি এখানে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অথবা মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হয়ে বলতে আসিনি। আমি এখানে আপনাদেরই একজন হয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছি। দেখুন, একটি কথা আপনারা মনে রাখবেন—মহাত্মা গান্ধী আপনার, আমার, সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি। সুতরাং এখানে আমাদের এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না, যাতে ভবিষ্যতে নিজেদেরই লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। আমার বোধহয়—আপনারা এখনও মহাত্মার কথা পুরোপুরি শোনেন নি এবং চুক্তিগুলির বিষয় যথেষ্ট অনুধাবন করেন নি। বন্ধু, আপনার আমার মত মহাত্মাও জানেন যে, ভারতের সমস্ত যুবক জেল থেকে মুক্তি না পেলে দেশে শান্তি আসতে পারে না। কিন্তু আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, সবেমাত্র একটা যুদ্ধের বিরতি হয়েছে—এ অবস্থায় এদের মুক্তি চাওয়া সম্ভব নয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছি। এদের মুক্তি চাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে—এরা বিভিন্ন সহিংস ক্রাইমে

অভিযুক্ত। আমি জানি—এই বন্দীদের জন্য আপনাদের মনে গভীর সহানুভূতি রয়েছে। আমারও আপনাদের মতই এদের জন্য সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন না যে, এদের অনেকেই আমার সুহৃদ। মহাত্মাকেও একথা আমি বলেছি যে, তাদের অনেকে এমন কি কংগ্রেস কমিটির কর্মসচীব। বন্ধুগণ, আপনারাই আজ পারেন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যাতে অহিংসদের মত এই সহিংসরাও ছাড়া পেতে পারেন।

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার : গান্ধী-আরউইন চুক্তি হল ঠিকই কিন্তু বিপ্লবী এবং জনসাধারণের উপর পুলিশী নির্যাতন একটুও কমল না।

[সাম্যাশ্রমের গোপন আস্তানা]

মাষ্টারদা : হরিপদ, আসানউল্লার অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ। তাই, আসানউল্লার শাস্তি মৃত্যু।

[হরিপদর হাতে পিস্তল দেন।]

হরিপদ : আমাকে আশীর্বাদ করুন মাষ্টারদা—আমি যেন সাফল্য অর্জন করতে পারি! [প্রণাম করেন।]

মাষ্টারদা : বন্দে মাতরম্!

হরিপদ : বন্দে মাতরম্! [প্রস্থান]

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রাম ফুটবল ময়দান। বিকেল বেলা। নেপথ্যে ফুটবল খেলা শেষ হওয়ার কোলাহল শোনা যায়। আসানউল্লা দলবলসহ প্রবেশ করেন। আসানউল্লার মাথায় খেলা জেতা কাপ।]

জনৈক ঃ হিপ্ হিপ্ হুররে ! [অন্যরা প্রতিধ্বনি করেন ।]

জনৈক ঃ আজকের খেলায় জিতল কারা ?

অন্যরা ঃ খান্ বাহাদুরের দল—আবার কারা ।

আসান ঃ হাঃ হাঃ—আমি ছাড়া আবার জিতবে কে ? আমি, আমি আসানউল্লা যাতে হাত দেব··· [হরিপদ আসেন এবং গুলি করেন ।] তাতে খান বাহাদুর······ আঃ ! আর আ-মা-র—রায় বাহাদুর হওয়া হল না ।

[গড়িয়ে পড়ে মারা যান ।]

—দৃশ্যান্তর—

[চট্টগ্রামের মুসলমান এলাকায় জেলা কর্তা প্রচার করছেন ।]

জেলা কর্তা ঃ ভাইসব, আপনারা দেখুন—এরা শুধুমাত্র আমাদের —অর্থাৎ খ্রীশ্চানদের নয়, আপনাদের অর্থাৎ ইস্‌লামেরও শত্রু ! খান বাহাদুর আসানউল্লাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা—তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ । মনে রাখবেন বন্ধুগণ, এরা যদি আমাদের এদেশ থেকে তাড়াতে না পারে—সমস্ত অত্যাচারটা গিয়ে পড়বে আপনাদের উপর । এদের স্বাধীনতা পাবার অর্থ—আপনাদের চির-অধীনতা । সুতরাং সময় থাকতে আপনারা সাবধান হোন, এই হত্যার প্রতিশোধ নিন ।

মুসলিম গুণ্ডারা ঃ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ—আল্লা হো আকবর ! লুট কর, আগুন জ্বালাও ! খান বাহাদুর আসান হত্যার প্রতিশোধ চাই !

—দৃশ্যান্তর—

[প্রচণ্ড দাঙ্গার দৃশ্য। জেলা কর্তার প্রবেশ।]

জেলা কর্তা : জ্বালাও, সমস্ত হিন্দুগ্রাম জ্বালিয়ে দাও! লুট কর, সমস্ত হিন্দুর দোকান লুঠ কর। [প্রস্থান]

[মৌলবী আবদুল গনির প্রবেশ।]

মৌলবী : না-না ভাইসব, এ আপনারা করবেন না। আসানউল্লাকে হত্যা করার অর্থ এই নয় যে, বিপ্লবীরা মুসলমানদের শত্রু। দারোগা আসানউল্লা বিপ্লবীদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করেছে। তাই বিপ্লবীরা সে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। এর ভিতরে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের শত্রুতার কোন ব্যাপার নেই। আমার একান্ত অনুরোধ—সাহেব-দের প্ররোচনায় আপনারা হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতা সৃষ্টি করবেন না। খোদাতালার নামে অনুরোধ করছি—এ আপনারা করবেন না, করবেন না।

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার : ভারতে এই ভীষণ দাঙ্গা ও পুলিশী অত্যাচারের বিষয়ে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বিলাতে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এক বক্তৃতা করলেন। কমনস্ সভার এই বক্তৃতায় স্বয়ং পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান মিষ্টার জর্জ হিক্সসহ পার্লামেন্টের সদস্যগণ এবং সমস্ত রাজ-নৈতিক দলগুলির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

[কমনস্ সভা—ভাষণরত যতীন্দ্র মোহন।]

যতীন্দ্র : চট্টগ্রামে ভয়ানক অত্যাচারের কাহিনী আপনারা শুনলেন। এবার আমি বলব—ভারতে বৃটিশ পুলিশ ও অফিসারদের আর এক নারকীয় অত্যাচারের কাহিনী—হিজলী জেল হত্যা। বাংলার মেদিনীপুর জেলাতে এই

হিজলী জেল। এখানে প্রায় দুইশ' বিনা বিচারে আটক বন্দী ছিল। সেদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি সাড়ে আটটায়, যখন বন্দীরা আহারাদির পর বিশ্রাম করছিলেন—ঠিক তখন ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার নিদ্রিত নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি করার নির্দেশ দিয়ে জেলরক্ষী বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে—ঘটনাস্থলেই তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ মিত্র নামে দুইজন বন্দী নিহত এবং শতাধিক বন্দী আহত হয়েছে। এই সংবাদে ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারণের মনে এক ভীষণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

বিবেকবান সদস্যবৃন্দ, আপনারা ভেবে দেখুন—এইসব বিনা বিচারে আটক বন্দীরা কি ভীষণ জীবন যাপন করছেন! প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত কি দুর্বিসহ সে জীবন। আর এই সমস্ত পুলিশ এবং অফিসাররা জেলের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেন, তাও নিশ্চয় আপনারা অনুমান করতে পারছেন। অথচ এদের অনেকেই কোন রকম হিংস্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি—তাঁরা মনে প্রাণে কংগ্রেসী, মোটেই হিংস্র পথাবলম্বী নন। ভদ্র মহোদয়গণ, একবার ভেবে দেখবেন—এইসব নিরীহ অহিংসার পূজারীদের এমন নির্বিচারে হত্যা করা—কতখানি নিষ্ঠুরতা।

মোট কথা—আজ ভারতবর্ষের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে সম্পত্তি ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং অত্যাচারের মাত্রা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত। একথা আজ স্পষ্ট যে, সুদূর লণ্ডনে বসে আর ভারতবর্ষকে শাসন করা যাচ্ছে না। মোট কথা, কঠোর শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষকে আর ধরে

রাখা যাবে না। বরঞ্চ স্বাধীনতা এবং শিষ্টাচারই এর সমাধান করতে পারবে।

১ম সদস্য ঃ মিঃ সেনগুপ্তকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? আপনার কথার মাঝখানে বলছি বলে দুঃখিত।

যতীন্দ্র ঃ ধন্যবাদ। যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন।

১ম সদস্য ঃ দেখুন, আপনার বক্তব্য শুনলে মনে হয়—কংগ্রেস সম্পূর্ণ অহিংস আর তার প্রতিটি সদস্যও অহিংস।

যতীন্দ্র ঃ নিশ্চয়।

১ম সদস্য ঃ কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারি কি? আমরা যদি বলি, ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসও হিংসার সমর্থক?

যতীন্দ্র ঃ নিশ্চয় না।

২য় সদস্য ঃ নিশ্চয় সমর্থক। নতুবা ভকত সিংয়ের মত এক জঘন্য খুনীর পক্ষে দয়া ভিক্ষা করত না কংগ্রেস।

['ঠিক-ঠিক'—ইত্যাদি আওয়াজ তোলেন অন্যরা।]

যতীন্দ্র ঃ মাননীয়গণ, আশা করি আপনারা দয়া করে আমার বক্তব্য শুনবেন। দেখুন, কংগ্রেস কখনই হিংসাত্মক আন্দোলন সমর্থন করে না। তবু যে কংগ্রেস সেই সময় ভকত সিং ও তার সাথীদের প্রাণ ভিক্ষা করেছিল, তার কারণ—কংগ্রেস বুঝতে পেরেছিল—ভারতবর্ষ অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। এসময়ে ভকত সিং ও তার সাথীদের ফাঁসী সেই আগুনে ঘৃতাহুতির সমান কাজ করবে। তাই কংগ্রেস ভকত সিং ও তার সাথীদের ফাঁসী রোধ করতে চেয়েছিল। আর তখন কংগ্রেসের সে আবেদন মেনে নিলে আজ সারা দেশে এই বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। আজ বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ চট্টগ্রামে যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা সরকারের এই চণ্ডনীতিরই ফল। এরপরও যদি সরকার

একইভাবে দমননীতি চালিয়ে যান, তাহলে কিছুতেই আর ভারতবর্ষকে বৃটেনের করায়ত্ত রাখা যাবে না।

২য় সদস্য : বাঃ বাঃ—তারা আমাদের ক্রমাগত হত্যা করে যাবে, আর আমরা তাদের শিষ্টাচার করে যাব—ভাল যুক্তি !

[অন্যরা সায় দেন।]

চেয়ারম্যান : যাকগে, আজ মিষ্টার সেনগুপ্তের অকপট ও স্বচ্ছন্দ বক্তব্য আমরা শুনলাম। যদিও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত নই, তবু তাঁর বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা, আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। [সভা ভেঙ্গে যায়। চেয়ারম্যান ও যতীন্দ্র দু'জন দু'দিক থেকে বেরিয়ে যান।]

১ম সদস্য : হুঁ, যা খুশী তাই বলে গেলেই হল !

২য় সদস্য : অত্যন্ত ভয়ানক লোক। বলে কি না—ওদের সঙ্গে শিষ্টাচার করতে হবে, স্বাধীনতা দিতে হবে। মিষ্টার টেগার্ট, এ লোকটি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

টেগার্ট : দাঁড়ান, ওর ব্যবস্থা হচ্ছে ! কেমন দুঃসাহস দেখলেন তো —এই সভাতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার কথা বলে শাশিয়ে গেল ! আমি নিজে জানি—ঐ সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ওর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। এইসব দু'মুখো সাপদের একদিনও বাইরে ছেড়ে রাখা চলে না।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

সূত্রধার : কমনস্‌ সভার বক্তৃতা আশানুরূপ সফল হল না। ওদিকে গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেল। দেশে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হতে থাকলেন। ফলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করে দ্রুত দেশে ফিরতে হল।

[২০শে জানুয়ারী, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। বোম্বাই বন্দরে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষারত ইটালিয়ান জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্র ও নেলী কথাবার্তা বলছেন।]

নেলী : কতদিন বাদে আবার দেশ থেকে ভারতে ফিরছি—বিয়ের পরের সেই রঙীন দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

যতীন্দ্র : সেবার কিন্তু আমরা কলকাতায় নেমেছিলাম।

নেলী : তা হোক, আসাটা একই রকম—তুমি, আমি, সমুদ্র আর জাহাজ সবই আগের মত।

যতীন্দ্র : না, এক রকম না—সেবার আমাদের একরাত্রি ডায়মণ্ড হারবারে কাটাতে হয়েছিল। মশার জ্বালায় তুমি পাগল হয়ে উঠেছিলে আর ভীষণ ভয় পেয়েছিলে।

নেলী : মোটেই না, মশার জন্য মোটেই ভয় পাইনি। মনে একটা শঙ্কা ছিল যে, তোমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে সহজভাবে নাও নিতে পারেন।

যতীন্দ্র : শুধু কি তাই, ভেবেছিলে—একটা ইণ্ডিয়ানের গলা ধরে ঝুলে পড়লাম, ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে।

নেলী : [কপট ক্রোধে] এই, বাজে কথা বলবে না কিন্তু !

যতীন্দ্র : আচ্ছা-আচ্ছা, তুমি ভাবনি—তোমার মা ভেবেছিলেন। কি, ভেবেছিলেন কি না ?

নেলী : না, মোটেই না।

যতীন্দ্র : ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন যে, মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিলাম।

নেলী : সত্যি, মা যে কত খুশীই হয়েছেন!

যতীন্দ্র : হবেন না—তার মেয়ে আজ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র-গিন্নি। কোন দিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, কেমব্রিজের কানাগলির মিসেস গ্রে?

নেলী : এই-এই, বেশী অহংকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! [যতীন্দ্র হাসেন] সত্যি সেদিন আর আজ কত তফাৎ—তাই না? সেদিনের সেই ছাত্র যতীন আজ পার্লামেন্টে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা করছে। ভাবতেও আমার বুকটা গর্বে ভরে উঠছে। বাবা তো সকলকে ডেকে ডেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন। [যতীন্দ্রকে চিন্তিত লক্ষ্য ক'রে] কি হল যতীন, কি ভাবছ?

[একজন ইউরোপীয় যুবক, নাম ম্যাকডোনাল্ড আসেন।]

ম্যাক : মাপ করবেন আমাকে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

নেলী : বলুন!

ম্যাক : আমি কি আপনাকে কোথাও দেখেছি?

নেলী : কোথায়—বলুন তো! [এগিয়ে যান]

ম্যাক : আপনি কেমব্রিজে পড়তেন না?

নেলী : হ্যাঁ।

ম্যাক : দর্শন আপনার বিষয় ছিল তো?

নেলী : হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?

ম্যাক : আমি ম্যাকডোনাল্ড—ম্যাকডোনাল্ড হেরিংটন।

নেলী : ওহো! মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। আপনি প্রফেসরদের মুখে মুখে খুব তর্ক করতেন, তাই সকলে আপনাকে র‍্যামেশীষ বলে ক্ষেপাত।

ম্যাক ঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তা কোথায় চলেছেন—ইণ্ডিয়া দেখতে বুঝি ?

নেলী ঃ না—ঠিক দেখতে নয়—

ম্যাক ঃ তবে কি কোন চাকরীর ব্যাপার ? যাক্‌গে—কিছু মনে করবেন না—ঐ আগ্‌লি ইণ্ডিয়ান নিগারটার সঙ্গে কি আলাপ করছিলেন ?

নেলী ঃ বাজে কথা বলবেন না, ভদ্র ভাবে কথা বলুন ! একজন ভদ্র মহিলার সঙ্গে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে জানেন না ?

ম্যাক ঃ কি হল, মানে—এর মধ্যে অভদ্রতার কি করলাম ! আমি তো শুধু বলেছি যে, আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা ঐ নিগারটার সঙ্গে—

নেলী ঃ চুপ করুন ! এসব কথা আপনি বলছেন কোন অধিকারে ?

ম্যাক ঃ এ্যাঃ ! হ্যাঁ, অধিকার আছে বৈ কি, পূর্ব পরিচয়ের অধিকার।

নেলী ঃ না, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ম্যাক ঃ অর্থাৎ, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি মিস্ নেলী গ্রে নন ?

নেলী ঃ নাঃ—আমি মিস্ নেলী গ্রে নই, মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা। [গটমট্ করে চিন্তিত যতীন্দ্রের কাছে চলে আসেন। যুবকটি হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকেন, তারপর চলে যান।]

যতীন্দ্র ঃ কি হয়েছে, হাঁপাচ্ছ কেন ?

নেলী ঃ কিছু না।

যতীন্দ্র ঃ কিছু নিয়ে বচসা হচ্ছিল—মনে হল !

নেলী ঃ ও তেমন কিছু নয়।

যতীন্দ্র ঃ আমার কাছে লুকোচ্ছ ? আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল বুঝি ?

নেলী ঃ [তীব্র কণ্ঠে] না। [কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কথা পাল্টাতে চেষ্টা করেন।] ও কিছু নয়। তুমি কি নিয়ে ভাবছ—কমনস্ সভার কথা নিশ্চয় ? [যতীন্দ্র হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন] কি গো, বল না—কমনস্ সভার কথা ভাবছিলে ?

যতীন্দ্র ঃ ঠিকই ধরেছ—ওখানকার প্রতিক্রিয়াটা তেমন ভাল লাগল না।

নেলী ঃ কেন-কেন, ওঁরা তো তোমার প্রশংসাই করলেন ?

যতীন্দ্র ঃ ওঁরা আমার বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন—বক্তব্যের নয়। আমি আশা করেছিলাম—ওঁরা আমার যুক্তিগুলি মানবেন—তাতে ওঁদেরও লাভ হত। আজ দেশের যা পরিস্থিতি তাতে ওঁরা টিকতেই পারবেন না। এরপর আবার গান্ধী-আরুইন চুক্তি বাতিল হয়ে গেল—দেশে যে কি ভীষণ অবস্থা কে জানে !

নেলী ঃ যতীন, প্লীজ তুমি ও নিয়ে আর মাথা খারাপ ক'র না। এখন না মানলেও পরে নিশ্চয় ওঁরা বুঝতে পারবেন। চিরকাল নিশ্চয় এ ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে না। এই, তাকাও আমার দিকে ! এই, আজ কিন্তু একবারও আমার সাজ-পোষাক ভাল হয়েছে কিনা বলনি। এই !

যতীন্দ্র ঃ ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। না, সত্যি ভাল হয়েছে। [উভয়ে হেসে ওঠেন।]

[কয়েকজন সিপাইসহ একজন পুলিশ অফিসার এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন কথা বলতে বলতে আসেন।]

ক্যাপ্টেন ঃ না-না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

অফিসার ঃ কিন্তু আমাদের কাছে নিয়ম মাফিক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ঃ কার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ?

অফিসার : কেন, ইংরেজ সরকার বাহাদুরের।

ক্যাপ্টেন : কিন্তু আপনারা ভুলে যাচ্ছেন—এটা বৃটিশ জাহাজ নয় — ইটালিয়ান জাহাজ। আপনার বৃটিশ সরকারের কোন অধিকার নেই এখানে। এই জাহাজের সমস্ত যাত্রী আমার প্রজা।

অফিসার : অর্থাৎ—আপনি মিঃ সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করতে দেবেন না।

ক্যাপ্টেন : না—কিছুতেই না। এ জাহাজ মহান ইটালীর অধীন। এই জাহাজে বিনা অনুমতিতে উঠে আসার জন্যই আপনাদের আমি গ্রেপ্তার করতে পারি এবং বেশী দেরী করলে হয়ত আমাকে তাই করতে হবে!

অফিসার : ওঃ—আচ্ছা—দেখা যাবে। [সদলে চলে যান।]

নেলী : দেখ, দেখ ঐ দিকে! বম্বে পোর্টটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না?

যতীন্দ্র : ভারী সুন্দর। যতই কাছে এগিয়ে আসছে—সব কিছু স্পষ্ট হচ্ছে।

নেলী : ঐ দেখ, মানুষগুলোকেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যতীন্দ্র : হুঁঃ। [জাহাজের হুইসেল বেজে ওঠে।] জাহাজ বোধহয় পোর্ট এরিয়াতে ঢুকল।

নেলী : দ্বিজেনবাবু, ক্ষিতিশবাবুরা নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

যতীন্দ্র : কি জানি—খবর তো পেয়েছেন। তবে যদি গ্রেপ্তার হয়ে গিয়ে থাকেন—

নেলী : না-না, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন।

[পূর্বের পুলিশ অফিসার ও সিপাইরা উঠে আসেন।]

১ম সিপাই : ঐ যে স্যার, ঐ তো জে. এম. সেনগুপ্ত।

[অফিসার যতীন্দ্রের কাছে এগিয়ে আসেন।]

নেলী : যতীন, ইণ্ডিয়ান পুলিশ।

অফিসার : আপনি—মিষ্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ?

যতীন্দ্র : হ্যাঁ, কেন ?

অফিসার : আপনি লণ্ডন থেকে ফিরছেন ?

যতীন্দ্র : হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন ?

অফিসার : আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। [পকেট থেকে কাগজ বের করে।] ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতরক্ষা আইনের তিন ধারা অনুসারে আমি আপনাকে—

নেলী : কিন্তু ও তো—

[ক্যাপ্টেন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন]

ক্যাপ্‌টেন : কি ব্যাপার, আবার আপনারা জাহাজে উঠে এসেছেন।

অফিসার : ভারতরক্ষা আইনের তিন ধারা অনুসারে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

ক্যাপ্‌টেন : থামুন, নতুবা আমি অন্য রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হব!

অফিসার : এই, এঁকে হাত কড়া লাগাও!

ক্যাপ্‌টেন : এত বড় দুঃসাহস! আপনারা জাহাজ থেকে নেমে যাবেন কি না ? [পকেট থেকে রিভলবার বের করেন।] এক্ষুনি নেমে যান বলছি!

অফিসার : মিষ্টার ক্যাপ্‌টেন, একজন নাবিক হিসাবে এই সামান্য আইনটুকু আপনার জানা উচিৎ ছিল যে, জাহাজ হোয়ার্পে ঢোকার পর তা পোর্টের অধীন হয়ে যায়। মনে রাখবেন —এটা বৃটিশ পোর্ট। তাই বৃটিশ সরকারের এখন এখানে পূর্ণ অধিকার।

ক্যাপ্‌টেন : ওঃ!

অফিসার : আশাকরি, আর আপনি আমাদের কাজে বাধা দেবেন

না। গ্রেপ্তার কর!

ক্যাপ্‌টেন : দুঃখিত মিষ্টার সেনগুপ্ত! আমার যতদূর সাধ্য আমি করেছি। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। বিদায়।

[চলে যান।]

[জাহাজ থেকে যাত্রী নামার আওয়াজ পাওয়া যায়।]

অফিসার : চল, চল, নিয়ে চল!

নেলী : কিন্তু ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়, কোথায় ওঁর দেখা পাব?

অফিসার : জানিনা।

নেলী : আমি ওঁর স্ত্রী—আমার জানবার অধিকার আছে। মনে রাখবেন আমি একজন বৃটিশ নাগরিক—আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—আমার স্বামীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

অফিসার : মাফ করবেন মিসেস—আমাদের বলবার নির্দেশ নেই।

[যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে পুলিশ দল চলে যায়, নেলী হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ এরপর বেশ কিছু দিন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনকে নিখোঁজ রাখা হয়। পরে অনেক অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে তাঁকে দার্জিলিং জেলে পাওয়া যায়। এদিকে চট্টগ্রামে 'ইণ্ডিয়ান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা' তাঁদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।*

[২৪শে সেপ্টেম্বর, সকাল বেলা, গোপন আস্তানা।]

মাষ্টারদা ঃ প্রীতি, আজকের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব নিতে হবে তোমাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ যে বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে তার প্রতিশোধ নিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ভারতবাসী আর নিরবে এ অত্যাচার সইবে না।

প্রীতিলতা ঃ মাষ্টারদা, জীবনের এই শুভক্ষণটির জন্য আমি প্রহর গুনছি। আজ আপনি আমাকে যে সুযোগ দিলেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু মাষ্টারদা, আমাদের এত সাহসী ও বীর যুবক থাকতে আমাকে নেত্রী করছেন কেন? আমি তো সহকারিণী হয়েই কাজ করতে চাই।

মাষ্টারদা ঃ না প্রীতি, বাংলার ঘরে ঘরে আজ আর বীর যুবকের অভাব নেই। বুড়িবালাম থেকে কালারপোল পর্যন্ত এদের দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে এবার শক্তির খেলায় মেতেছে, সে ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। তোমার সাফল্যে কিংবা তোমরা আত্মদানে সেই

*যাঁরা নাটকটিকে বৃহদাকারে অভিনয় করতে চান, তাঁরা এইখানে অতিরিক্ত দৃশ্য [ক] অর্থাৎ "ধলঘাটের যুদ্ধ" বর্ণিত দৃশ্যটি অভিনয় করবেন। পরে যথারীতি অনুসরণ করবেন।

অধ্যায়ের সূচনা হোক—এই আমি চাই। ইংরেজ তথা বিশ্বজগৎ দেখুক যে, এ দেশের মেয়েরাও আর পিছিয়ে নেই।

প্রীতিলতা ঃ আমাকে আশীর্বাদ করুন মাষ্টারদা ! [প্রণাম করেন।]

মাষ্টারদা ঃ [আশীর্বাদ ক'রে] এই ব্যাগে তোমার হাত বোমা, এই তোমার পিস্তল। আর এরা তোমাকে সাহায্য করবে।

প্রীতিলতা ঃ [হাত বোমা ও পিস্তল গ্রহণ করেন এবং মাষ্টারদাকে অভিবাদন করেন।] বন্দে মাতরম্ !

মাষ্টারদা ঃ বন্দে মাতরম্ !

—দৃশ্যান্তর—

[২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে নয়টা। প্রীতিলতার নেতৃত্বে সাতজন যুবক ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে এগিয়ে যান। তাঁরা বোমা ছুঁড়তে উদ্যত হন। দৃশ্যটি স্থির হয়ে যায়। প্রীতিলতার ভারতীয় নারীদের প্রতি শেষ আহ্বান আকাশবানীর মত শোনা যায় ঃ—

"আমি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভারতীয় গণতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সদস্যা, পরম গৌরব অনুভব করছি যে, আমার দেশের মুক্তির জন্য আমি এই সশস্ত্র যুদ্ধ করছি। বৃটিশ জোর পূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নর নারীর রক্ত শোষণ করে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করেছে। আমাদের মুক্তি পথের সে বাধা দূর করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজ দেশের এই দুর্দিনে যদি আমাদের ভাইয়েরা মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে—বোনেরা কেন পারবে না? ইতিহাসে অনেক অনেক সাক্ষ্য আছে। না, আজ ভারতীয় নারীও কঠোর

সংকল্প নিয়েছে—তাঁরা আর পিছিয়ে থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরাও ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। এই কথা প্রমাণ করবার জন্য আমি আজকের অভিযানে নেতৃত্ব গ্রহণ করছি।

আমার শেষ এবং অন্তিম আশা, আমার দেশের ভগ্নীরা নিজেদের অবলা মনে করবেন না, সহস্র বাধা ও বিপদ চূর্ণ করে এই বিদ্রোহে ও মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বন্দে মাতরম্!"

দৃশ্যটি সচল হয়। বোমার ও পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়।]

—দৃশ্যান্তর—

সূত্রধার ঃ এদিকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রয়োজনে আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহনকে পাঠান হল রাঁচীতে। সেখানে নগেন্দ্র লজ—নামে একটি বাড়ীতে তাঁকে নজর-বন্দী করে রাখা হল।

[রাঁচীর নগেন্দ্র লজের অভ্যন্তরস্থ শয়ন কক্ষ। ২২শে জুলাই, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, অপরাহ্ন। রোগজীর্ণ অবসাদগ্রস্ত যতীন্দ্র মোহন, নেলী ও আইলীন আসেন। তাঁদের ভ্রমণের পোষাক।]

আইলীন ঃ আর একটু বেড়ালে বোধহয় ভালই করতে জেঠু—বাড়ী ফিরে তো কষ্ট আরও বাড়ল।

যতীন্দ্র ঃ না, না—ঐ পাগলা গারদটা চোখে পড়লেই আমার ভীষণ খারাপ লাগে। এ কি অত্যাচার, বেছে বেছে এই জন-মানবহীন এলাকার এই নগেন্দ্র লজ! আর ঐ পাগলা গারদটার কথা মনে পড়লেই আমার মনে হয়—আমিও পাগল হয়ে যাব। উঃ!

আইলীন ঃ জেঠু !

নেলী ঃ যতীন আবার ঐ সব ভাবছ ?

যতীন্দ্র ঃ ভাবছি কি এমনি ? আমাকে যে কতদিন এ ভাবে বন্দী থাকতে হবে তাও পর্যন্ত জানি না। 'অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী'—অদ্ভুত আইন! আসলে সমস্ত জীবন আমাকে এই ঘরে, এই জনমানবহীন এলাকায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে। একটা চেয়ার পর্যন্ত দেয়নি! আমি যাত্রামোহন সেনের ছেলে যতীন্দ্রমোহন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জে. এম., কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ সেনগুপ্ত কি মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শোব ?

নেলী ঃ ও নিয়ে আর ভাবছ কেন, মিঃ বিড়লা তো সবই পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

যতীন্দ্র ঃ বিড়লা কেন দেবে, সরকার কেন দেবে না, এ কি ইচ্ছে করে অপমান করা নয় ?

আইলীন ঃ জেঠু, একটু শান্ত হও জেঠু—একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর !

যতীন্দ্র ঃ কি করে শান্ত হব বল, শান্তি আমি পাচ্ছি কোথায় ?

নেলী ঃ যতীন, তোমার প্রেসার নিশ্চয় বেড়ে গিয়েছে—তুমি যত কথা বলবে ততই তোমার ক্ষতি হবে।

যতীন্দ্র ঃ ক্ষতির আর কি বাকী আছে নেলী ? কি মিথ্যা অভিযোগ—আমি নাকি ভিতরে ভিতরে সশস্ত্র আন্দোলনকে মদত যোগাই ! হায় ! সারা জীবন ধরে একনিষ্ঠ ভাবে অহিংস থাকার এই পুরস্কার !

আইলীন ঃ ওরা এমন কথা ভাবল কি করে ?

যতীন্দ্র ঃ ঐ যে ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, হায় ! ছাত্র সম্মেলনে ও কথা কেন বলেছিলাম জানিস ? দেখ, গান্ধী—আরুইন চুক্তিতে টেররিষ্টরা ছাড়া পেল না। ফলে, পুরো যুব সমাজ কংগ্রেস ত্যাগ করে বিপ্লবের পথে ঝুঁকে

পড়ছিল। তাই, তাদের মন ঘোরাতে আমাকে টেররিষ্টদের পক্ষ টেনে কথা বলতে হয়েছিল। তুই তো জানিস না ইলা—যুব সমাজ আমাদের উপর এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে, নোয়াখালীতে আমার পথ রোধ করে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। আর সেই বক্তৃতার জন্যই সরকার আমাকে বন্দী করল। এই বুঝল তারা আমাকে! আবার সুসভ্য বুদ্ধিমান জাত বলে গর্ব করে বৃটিশজাত—এই তাদের বুদ্ধির নমুনা! [নেলী মাথা নিচু করেন।] আর এখানে আমাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে। চমৎকার ডাক্তারী হচ্ছে—রোজ জেঁাক লাগিয়ে আমার সমস্ত রক্তটুকু শুষে নিচ্ছে! আর বেশী দেরী নেই--বাকি রক্তটুকু শুষে নিতে যে ক'দিন বাকি।

নেলী ঃ যতীন, আবার সেই কথা বলছ?

যতীন্দ্র ঃ মিথ্যে বলছি আমি, রোজ রোজ এইভাবে জেঁাক দিয়ে রক্ত শুষিয়ে নিলে শরীর কতদিন টেকে?

আইলীন ঃ জেঠু অত চিন্তা করছ কেন? জেঠাইমা তো কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার পাঠাবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে।

যতীন্দ্র ঃ আর পাঠিয়েছে! তদ্বির তদারক না করলে ও আবেদনে কিছু হয় না। কেউ আমার জন্য কিছু করবে না। বুঝতে পারছ না অবস্থাটা—যে বিধান, নলিনী, কিরণ শঙ্করকে আমি কংগ্রেসে নিয়ে এলাম, তারাই আজ আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। মানুষের ভাগ্য দেখ নেলী, সহিংসদের ছাড়াবার চেষ্টা না করার অভিযোগে সুভাষপন্থীরা হল শত্রু। আবার তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখানোর অভিযোগে সরকার করল বন্দী। মানুষ তবে কি করবে? কমনস্ সভায় কি অন্যায় বলেছিলাম আমি? বল, বল—কি অন্যায় বলেছিলাম!

নেলী ঃ যতীন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। প্লীজ তুমি একটু চুপ কর—তোমার শরীর ভীষণ খারাপ !

যতীন্দ্র ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন তো আর আমার কথা তোমারও ভাল লাগবে না—এখন কি আর আমার সে সম্মান আছে—না—আর আমি কর্পোরেশনের মেয়র আছি।

আইলীন ঃ জেঠু এসব কি বলছ ?

যতীন্দ্র ঃ আরে আমি জানি—তোমরা আর আগের মত ভালবাস না আমাকে। [আইলীন ও নেলী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কড়া নাড়ার আওয়াজ।]

আইলীন ঃ বোধ হয় ফাদার পিটার এসেছেন।

[নেলী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন, পাদ্রী ডাক্তার ফাদার পিটার আসেন।]

পিটার ঃ শুভ সন্ধ্যা।

নেলী ঃ শুভ সন্ধ্যা।

পিটার ঃ এখন কেমন আছেন ?

নেলী ঃ একই রকম। দেখবেন আসুন !

পিটার ঃ [যতীন্দ্র মোহনের কাছে গিয়ে] কেমন আছেন বলুন। নিশ্চয় ভাল ?

যতীন্দ্র ঃ আজ্ঞে······

পিটার ঃ দেখি নাড়িটা, প্রেসার এখন কেমন ? [ভয়ার্ত যতীন্দ্রের নাড়ি দেখেন] বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ?

আইলীন ঃ হ্যাঁ, তবে একটুখানি গিয়েই—'ভাল লাগছে না' বলে ফিরে এলেন।

পিটার ঃ হুঁ, প্রেসারটা তো বেড়েছে দেখছি—রক্ত মোক্ষণ করা দরকার।

যতীন্দ্র ঃ আবার রক্ত মোক্ষণ ?

পিটার ঃ হেঃ-হেঃ—চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদেব যেমন নির্দেশ দেয়,

তেমন করতে আমরা বাধ্য মিষ্টার সেনগুপ্ত। আপনার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে—একথা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

নেলী ঃ তা নয়—রোজ রোজ রক্ত বের করা হচ্ছে তো, তাই উনি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

পিটার ঃ মিসেস্, রোগীর মনোভাবের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা চলে না। চিকিৎসকের কাছে রোগী একটি 'কেস'—একটি সমস্যা। রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দেওয়া ডাক্তারের কাজ নয়। ডাক্তারের কাজ—রোগের উপশম করা।

যতীন্দ্র ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে—চলুন!

পিটার ঃ জোঁক কি আর আছে? নৈলে আবার ছুরি দিয়ে শিরা কেটে রক্ত বের করতে হবে।

নেলী ঃ আছে। [সকলে পাশের ঘরে যান। পরে একা ফিরে আসেন এবং চিঠির বাক্স থেকে একটা চিঠি বের করে পড়তে পড়তে হতাশ হয়ে বসে পড়েন। কেউ আসছে মনে করে চিঠিটা লুকাতে উদ্যোগ করেন এবং আইলীনকে দেখে আস্বস্থ হয়ে আর লুকান না।] তুই চলে এলি যে?

আইলীন ঃ আমি আর থাকতে পারলাম না জেঠাইমা—জেঠু ঐ ভাবে কাঁধে জোঁক লাগিয়ে বসে আছে—এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। ওটা কিসের চিঠি জেঠাইমা, কিসের চিঠি?

নেলী ঃ ইলা, ইলা সব আশা শেষ। [কেঁদে ফেলেন।]

আইলীন ঃ কি, কি হয়েছে জেঠাইমা?

নেলী ঃ ওরা উত্তর দিয়েছে—কলকাতা থেকে কোন ডাক্তার পাঠান সম্ভব নয়। আমি এখন কি করব ইলু—সুখেন্দু বাবুরাও কাছে নেই—কি করব আমি?

আইলীন : কেঁদনা জেঠাইমা, জেঠু শুনতে পাবে—কেঁদনা জেঠাই-মা ! [সামলে নেন। পিটার আসেন, তাকে খুব কৃতার্থ দেখায়।]

পিটার : হেঃ হেঃ হেঃ, আপাততঃ আর ভয় নেই, এখন কয়েকদিন ভালই থাকবেন। আমি আবার আগামী সপ্তাহে দেখে যাব। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শুভ রাত্রি !

নেলী : শুভ রাত্রি ! [পিটার চলে যান]

আইলীন : জেঠুকে কি এখন খেতে দেবে ?

নেলী : না, আজ বেশী রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে—বলেছে। [যতীন্দ্র আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে আসেন।]

যতীন্দ্র : ভুল, সব ভুল। ডাক্তারী ভুল, রাজনীতি ভুল, বিচার ভুল —সব ভুল !

নেলী : এ কি, তুমি এক্ষুণি উঠে এলে ! ডাক্তার যে বলে গেলেন তোম কে বিশ্রাম করতে ?

যতীন্দ্র : থাম ! ডাক্তার ভুল—আমার মনের অবস্থা সে কি বুঝবে ? ইলু, ইলু মা, ঐ জোঁক দুটো ওখানে রয়েছে—একটু জলে ছেড়ে দিয়ে আয় তো—মরে যাবে। [ইলা ইতস্ততঃ করে।] ভাবছিস কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? যা। বেশীক্ষণ ওভাবে থাকলে মরে যাবে।

আইলীন : থাক না জেঠু—মরলে কিছু হবে না, আরও জোঁক আছে।

যতীন্দ্র : না, না—ছেড়ে দিয়ে আয়—ও গুলোই বা মরবে কেন ? দাঁড়িয়ে রইলি যে—যা।

আইলীন : [অসহায় ভাবে নেলীর দিকে তাকান। নেলী ইঙ্গিত করেন।] যাচ্ছি, যাচ্ছি। [চলে যান]

যতীন্দ্র : আমাকে খেতে দাও, আমার ক্ষিদে পেয়েছে !

নেলী : সে কি, তুমি যে বল্লে—বেশী রাত্রে আমাদের সঙ্গে খাবে ?

যতীন্দ্র : না-না, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে—আমি এক্ষুণি খেয়ে ঘুমাব।

নেলী : আচ্ছা-আচ্ছা, তুমি বোস, আমি খাবার নিয়ে আসছি !

[আইলীন আসেন।]

যতীন্দ্র : জলে ছেড়ে দিয়েছিস ?

আইলীন : [নেলীর ইঙ্গিতে] হ্যাঁ। [নেলী চলে যান।]

যতীন্দ্র : আয়, আমার কাছে বোস ! বুঝলি ইলা, কোথায় যেন একটা বিরাট ভুল হয়ে যাচ্ছে। দেখ, মহাত্মা গান্ধীও গিয়ে শবরমতিতে আশ্রম করলেন, আর সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। জানিস, সেই দিন থেকেই আমার মনে একটা বিরাট খট্‌কা—

আইলীন : কোনদিন জেঠু ?

যতীন্দ্র : ও, তুই তো জানিস না। সেবার চট্টগ্রামে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন। একজন দারোগা অাদেশ দিল—কোন রকম ধ্বনি দেওয়া চলবে না। সমস্ত প্রতিনিধিরাও মাথা পেতে সেই সামান্য দারোগার আদেশ মেনে নিলেন। কি জানি—সে দিন আমরা ভয় পেয়েছিলাম, না সেটা ছিল আমাদের নৈতিক ভুল—কে জানে ! কিন্তু আমার মনে লজ্জা, অনুতাপ—কি যেন একটা অসহায় ভাব—ঠিক তোকে বোঝাতে পারব না।

আইলীন : থাকগে জেঠু—যা গেছে তা যাক ! ও নিয়ে ভেবে আর কি লাভ ?

যতীন্দ্র : ভাবছি কি আর এমনি—সুভাষ যে সারা দেশটাকে খেপিয়ে তুলেছেরে ! দেখ, আমার কথা হচ্ছে—ইংরেজের প্রভুত্ব ও একাধিপত্য আমরা চাই না। তাই বলে ইংরেজ বর্জিত, শেতাঙ্গ বর্জিত ভারতবর্ষও আমাদের

কাম্য নয়। অথচ এরা নির্বিচারে সেই ক্ষেপা আন্দোলনই চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ইংরেজ সরকারও বুঝছেন না যে, যত তাঁরা নির্যাতন চালাচ্ছেন, যুক্তি ততই বিপ্লবীদের পক্ষে চলে যাচ্ছে। এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করলাম বলে আমি হলাম—অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী। আমাকে মেরে ফেলবে ইলা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! দেখিস, কলকাতা থেকে কোন ডাক্তার ওরা পাঠাবে না।

আইলীন ঃ পাঠাবে জেঠু, নিশ্চয় পাঠাবে। [গলা ধরে আসে।]

যতীন্দ্র ঃ তুই আমাকে মিথ্যে স্তোক দিসনে মা। আর কবে পাঠাবে? ওঃ, একবার যদি এখান থেকে বেরুতে পারতাম! এই ঘরে আমাকে মরতে হবে-একটু একটু করে, তিলে তিলে—ওঃ! এই শোন, জোঁক গুলোকে কি জলে ছেড়ে দিয়েছিস? [আইলীন কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে ইতস্ততঃ করে।] দিসনি তো, খুব ভাল করেছিস। এক্ষুনি ওগুলোর মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেল! একটুও দেরী করিস না - যা!

আইলীন ঃ জেঠু!

যতীন্দ্র ঃ যা বলছি, জলদি যা! [আইলীন ভয়ে ভয়ে চলে যান।]

যতীন্দ্র ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, জোঁকের মুখে নুনই দিতে হয়—যদি সে তোমার রক্ত শোষণ করতে চায়! বসে বসে কাঁদা কোন কাজের কথা নয় —"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।" এ্যাঁ! তবে? তবে কি সুভাষরাই ঠিক—পাল্টা মার ছাড়া বৃটিশরা কোন কথা শুনবে না? ওঃ হো, সুভাষকে বড্ড দরকার! ওর সাকরেদরা তাকে আমার কাছে আসতে দেয় না। সুভাষকে একবার কাছে পেলে চেষ্টা করে দেখতাম গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষবাদের মিলন করা যায় কিনা, দেশকে রক্ষা করা যায় কিনা! ওরে কে

আছিস—একবার সুভাষকে আমার কাছে নিয়ে আয়! [চিৎকার শুনে ইলা দৌড়ে ঢোকেন।] কে? তোমরা কারা? কি চাও?

আইলীন: [অস্বাভাবিক ভাব দেখে থমকে দাঁড়ান।] জেঠু!

যতীন্দ্র: এ্যাঃ! [যেন কোন উত্তর শুনলেন।] তা বেশ তো, আমিও তো ভারতীয় জনগণের একজন! [ভয়ার্ত ভাবে] এ কি, তোমাদের চোখে ও কিসের ভ্রুকুটিল প্রশ্ন? আমরা ভুল করেছি কিনা?

আইলীন: জেঠু আমি!

যতীন্দ্র: ঠিক জানি না। হয়ত ভুলই করেছি। ওকি সহস্র সহস্র ভ্রুকুটিল প্রশ্ন নিয়ে তোমরা আমাকে ঘিরে ধরছ কেন?

আইলীন: জেঠু কি বলছ তুমি? [এগিয়ে আসেন।]

যতীন্দ্র: না-না, আর এগিয়ো না তোমরা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! ভুল যদি করেই থাকি, তার কি ক্ষমা নেই? তোমরা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!

আইলীন: জেঠু! জেঠাইমা, শীগগীর এসো জেঠাইমা!

[যতীন্দ্রকে ধরতে যান।]

যতীন্দ্র: না—আর এগিও না! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাঁচাও-বাঁচাও নেলী! [নেলী দৌড়ে আসেন। আইলীন যতীন্দ্রকে বিছানার কাছে নিয়ে এসেছেন।]

নেলী: কি, কি হয়েছে?

যতীন্দ্র: বাঁচাও—বাঁ-চা-ও! নেলী! [হাত দুটি উত্তোলিত করে অবসন্ন হয়ে পড়ে যায়।]

নেলী: [জড়িয়ে ধরেন।] কি, কি? এই তো আমি—বল—যতীন, যতীন, যতীন!

যতীন্দ্র: নেলী, সু-ভা-ষ ...... [যতীন্দ্রের কথা গোঙানীর আওয়াজে অস্পষ্ট।]

নেলী ঃ ইলা, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। [আইলীন দৌড়ে বেরিয়ে যান।] কি, কি, বল, এই তো আমি। [যতীন্দ্রের মাথা ঢলে পড়ে।] যতীন !

ঃ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ঃ



—উপসংহার দৃশ্য—

[এই দৃশ্যটি প্রস্তাবনা দৃশ্যের ক্রমপরিণতি। একইভাবে সূত্রধার বলে চলেছে, শ্রোতারা শুনছে।]

সূত্রধার ঃ এইভাবে ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতার জীবনাবসান ঘটল। চট্টগ্রামের ইতিহাস মোটামুটি শুনলে—আশা করি এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেছ।

রামু ঃ কিন্তু মাষ্টারদা, মাষ্টারদার কি হল ?

সূত্রধার ঃ মাষ্টারদা ? আমাদের দুর্ভাগ্য রামু; মাষ্টারদাও বিরাট এক সংঘর্ষের সময় গৈরলা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর গহীরা সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হলেন তারকেশ্বর দস্তিদার ও শ্রীমতি কল্পনা দত্ত। তারপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়ে গেল। না, বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন—যে বেইমানী করে মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল—সেও রেহাই পায়নি বিপ্লবীদের কাছে। মাষ্টারদার ফাঁসীর তিন দিন আগেই দা'য়ের এক কোপে ধরাধাম থেকে সরে যেতে হয় তাকে। এতেই ক্ষান্ত হননি বিপ্লবীরা। মাষ্টারদা হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁরা আক্রমণ করেছিলেন ইউরোপীয়ান ক্রিকেট ক্লাব * এর ফলে দুইজন ইংরেজ নিহত ও প্রচুর আহত হন। এই প্রতিশোধ গ্রহণ অমর করে

---

*বৃহদাকারে অভিনয়েচ্ছুগণ এইখানে অতিরিক্ত দৃশ্য (খ) অভিনয় করবেন।

রেখেছে কৃষ্ণ চৌধুরী, হিমাংশু সেন, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ও নিত্যরঞ্জন সেনের নাম।

আর সব থেকে মজার কথা কি জান, মহাশক্তিধর বৃটিশ সরকার এত ভয় পেয়েছিল যে, দুটো লোককে ফাঁসী দেবার জন্য সমগ্র চট্টগ্রাম জেলাতে নৈশ আইন জারী করে মিলিটারীর আঁওতাধীন করেছিল। কিন্তু এত সতর্কতার সঙ্গে ফাঁসী দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি সরকার বাহাদুর—মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের দেহ দুটিকে বস্তা বন্দী করে বঙ্গোপসাগরের গভীর জলে পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভয়, পাছে মাষ্টারদার শরীর ভারতের মাটিতে রাখলে, তা থেকে যদি 'মাষ্টারদা' গাছ জন্মায়, আর তাতে 'মাষ্টারদা-ফল' ফলে! কিন্তু এত করেও রুখতে পারেনি বৃটিশ সরকার। মাষ্টারদার শেষ বাণী, যা তিনি ফাঁসীর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আগে লিখে ছিলেন, পৌঁছে গেছে ভারতের জনসাধারণের কাছে। দাঁড়াও, বোধহয়, বাণীটা আছে আমার কাছে। [পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে খুঁজতে থাকে।]

সকলে ঃ আছে!!!

রামু ঃ কৈ কৈ সে বাণী?

সূত্রধার ঃ এটা-না—এই তো এইটা।

[সূত্রধার কাগজখানি পড়ছে—অন্যরা শুনছে। রামুর মানসচক্ষে মাষ্টারদার চেহারা ফুটে ওঠে মূর্তি ঘেরা মণ্ডপটির গায়ে এবং সূত্রধারের কণ্ঠের পরিবর্তে মাষ্টারদার কণ্ঠস্বরে তাঁর শেষ বাণী শোনা যায় ঃ—]

আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসীর রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে, মৃত্যু দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে।

এই তো সাধনার সময়, বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সময়, ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার সময়। কত মধুর তোমাদের স্মৃতি। ভাই বোনেরা, তোমাদের মধুর স্মৃতি আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। এই পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভোর উৎসাহে ও আক্লান্তভাবে পাগলের মত সেই স্বপ্নের পিছনে ছুটেছি আমি—জানি না কোথায় আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে যদি মৃত্যুর হীমশীতল হাত তোমাদেরও স্পর্শ করে—তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দিও—আজ যেমন আমি তোমাদের দিলাম। হে আমার বন্ধুরা, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—থেমে যেওনা! পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ঐ দেখা যাচ্ছে—স্বাধীনতার নব অরুণোদয়। কখনও হতাশ হয়ো না—সাফল্য আমাদের হবেই! ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের ইষ্টার বিদ্রোহের কথা কোনও দিন ভুলো না। জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা মনে রেখো। স্বাধীনতার বেদীমূলে যে সব দেশ প্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো!

আমার একান্ত আবেদন—আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে। কারাগারের বাইরের এবং ভিতরের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ।

বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী

হোক ! বন্দে মাতরম্ ! [মানসছবি ও কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়।]

রামু : [চিৎকার করে] না-না, মাষ্টারদা, যাবেন না মাষ্টারদা ! মাষ্টারদা, মাষ্টারদা ! [সকলে বিস্মিত হয়ে তাকায়।] মাষ্টারদা, শুনুন মাষ্টারদা ! মা-ষ্টা-র-দা !

সকলে : কি হল ?

নুরুল : এই রামু কি হল ?

রামু : মাষ্টারদা, মাষ্টারদা কোথায় গেলেন আপনি ? মাষ্টারদা ! ! [ব্যাকুল হয়ে মাষ্টারদাকে খুঁজতে থাকে।]

কালু : ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নিমাই : ওর কি সন্ন্যাস রোগ আছে ?

রামু : কোথায়, কোথায় ? [দৌড়ে বাইরে যেতে গেলে নুরুল তাকে ধরে ফেলে।]

নুরুল : এই রামু কি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছিস তুই ? এই ধর তো ওকে ! [সকলে ধরে।]

রামু : মাষ্টারদা এসেছেন নুরুদা, মাষ্টারদা এসেছেন।

নুরুল : চুপ, কর ! কোথায় মাষ্টারদা ?

রামু : হ্যাঁ গো—আমি তাঁকে দেখেছি—সত্যি। তোমার পায়ে পড়ি নুরুদা, আমাকে ছেড়ে দাও—মাষ্টারদার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে !

নুরুল : [অদ্ভুত আত্মস্থভাবে] কি কথা আছে ?

রামু : আমাকে ছেড়ে দাও নুরুদা—আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব মাষ্টারদাকে !

নুরুল : কি প্রশ্ন বল !

রামু : তোমাকে ?

নুরুল : [কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়।] হাঁা, আমাকে—আমিই সূর্য সেন। বল, কি তোমার প্রশ্ন ?

রামু ঃ [বিহ্বল ভাবে।] তুমিই সূর্য সেন—মাষ্টারদা সূর্য সেন ?

নুরুল ঃ হ্যাঁ, মাষ্টারদা সূর্য সেন।

রামু ঃ মাষ্টারদা !

নুরুল ঃ বলো !

রামু ঃ মাষ্টারদা, হয়ত আপনি আমাদের চিনবেন না—

নুরুল ঃ কেন চিনব না—তোমরা তো আমাদের স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক।

রামু ঃ [ঠিক যেন বুঝতে পারেনি, এমন ভাবে।] স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক…… !

নুরুল ঃ কেন ভারতবর্ষ কি আজও স্বাধীন হয় নি ?

রামু ঃ না-না, ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। তবে……

নুরুল ঃ কি তবে ?

রামু ঃ আসলে মাষ্টারদা, স্বাধীনতা জিনিষটা কি সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না।

নুরুল ঃ কেন ?

রামু ঃ সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করব মাষ্টারদা। আচ্ছা মাষ্টারদা, আপনারা প্রথমে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা অন্য দেশে উড়িয়ে ছিলেন কেন ?

নুরুল ঃ অন্য দেশ ! অন্য দেশে কেন হবে। প্রথম স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়েছিল চট্টগ্রামে।

রামু ঃ চট্টগ্রাম ! চট্টগ্রাম বলে তো কোন জায়গা ভারতবর্ষে নেই। তবে কি অন্য কোন ভারতবর্ষ আছে ?

নুরুল ঃ না, পৃথিবীতে ভারতবর্ষ তো একটাই—চিরকাল বিস্ময়, প্রাচুর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের দেশ ভারতবর্ষ। 'এমন দেশটি কোথও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। 'উত্তরে শ্বেত চূড়া শোভিত গিরিরাজ

ধ্যানমৌন। আর মায়ের বুকের উদার করুণাধারা নিয়ে অনন্তের পানে ছুটে চলেছে—গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র।

রামু ঃ কি বল্লেন, সিন্ধু? সিন্ধুও কি গঙ্গার মত একটা নদীর নাম?

নুরুল ঃ হ্যাঁ, সিন্ধুনদ।

রামু ঃ কিন্তু, সিন্ধু বলে তো কোন নদী নেই আমাদের দেশে।

নুরুল ঃ কি, বলছ কি?

রামু ঃ হ্যাঁ, মাষ্টারদা, তাকিয়ে দেখুন—হিমালয় আছে কিন্তু সিন্ধু নদী নেই।

নুরুল ঃ সিন্ধু নদ নেই?

রামু ঃ না, নেই।

নুরুল ঃ তা কেমন করে হয়! দাঁড়াও দেখি। [যেন স্বর্গ থেকে মর্তের দিকে তাকাচ্ছে তেমন ভাবে দেখে।] একি!

রামু ঃ বলুন, বলুন মাষ্টারদা, এই কি আপনার স্বপ্নের ভারত?

নুরুল ঃ একি- একি, আমার ভারতমাতাকে তিনখণ্ড করেছে কে?

রামু ঃ এই কি সেই ভারত, মাষ্টারদা?

নুরুল ঃ অ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো উত্তরে হিমালয়, ঐ তো পদ্মার বুকে গাঙচীল উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গঙ্গা বয়ে চলেছে পূণ্যপীযূষধারা নিয়ে, ঐ তো উত্তাল সিন্ধু ছুটে চলেছে মহাসিন্ধুর দিকে। কিন্তু কে, কে এমন খণ্ডক্ষুদ্র করেছে আমার মাকে, কে?

রামু ঃ আমরা জানি না, মাষ্টারদা।

নুরুল ঃ হায়—আমার দেশ—আমার মা—'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'—তাকে আজ ত্রিখণ্ডিত করেছে! ওকি, ওরা কারা—অমন নিরন্ন, অমন ক্ষুব্ধ, অমন ক্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন —ওরা কারা?

রামু ঃ এরা তো আমাদের দেশের লোক।

নুরুল ঃ স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক!

রামু ঃ হ্যাঁ, মাষ্টারদা।

নুরুল ঃ তবে ওরা অমন উদভ্রান্ত, ভীত-ত্রস্ত কেন? কবি কি বলেন নি যে, 'চিত্ত যেথা ভয় শুন্য উচ্চ যেথা শির'— ভারতকে হতে হবে তেমন দেশ। এদের দেখে তো নিস্প্রাণ মৃত মানুষের এক চলমান সমষ্টি বলে মনে হচ্ছে।

রামু ঃ হ্যাঁ, মাষ্টারদা, আমাদের ভীষণ ভয় করে। প্রতিদিন ভয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে এক পিছল পথে পা টিপে টিপে চলেছি আমরা।

নুরুল ঃ কেন?

রামু ঃ ভয়ে, অত্যাচারের ভয়ে।

নুরুল ঃ অত্যাচার—আজও অত্যাচার!

রামু ঃ হ্যাঁ মাষ্টারদা, আজও অত্যাচার।

নুরুল ঃ কারা সেই অত্যাচারী।

রামু ঃ আমি জানিনা মাষ্টারদা।

নুরুল ঃ কিন্তু অনন্ত, গণেশ, লোকনাথ, বিনোদ এরা কি করছে? তারা আজ কোথায়? ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনী কোথায়? অত্যাচারীদের আজও দমন করতে পারেনি তারা?

রামু ঃ মাষ্টারদা, ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী বাহিনী বলে তো কিছু নেই। চট্টগ্রাম শাখাও নেই।

নুরুল ঃ কেন, আমার ফাঁসীর পর কি তারা সবাই নিরব হয়ে গিয়েছে?

রামু ঃ কি জানি।

সূত্রধার ঃ না রামু, ভুল হয়ে যাচ্ছে—মাষ্টারদার ফাঁসীর পরেও

নয় বছর ধরে বিনোদ দত্তের নেতৃত্বে তাঁরা আন্দোলন চালিয়েছেন। কিন্তু আজ আর সে বাহিনী নেই।

রামু : হ্যাঁ—নেই।

নুরুল : নেই! [ভীষণ হতাশভাবে] ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনী নেই! আজও অত্যাচারীর ভীম হুহুঙ্কারে ভারতবাসী ভীতত্রস্ত, নিরন্ন, ক্লিষ্ট! ভারতমাতা ত্রিখণ্ডিত! আমি কি ব্যর্থ? [চিন্তিত।]

রামু : মাষ্টারদা, মাষ্টারদা!

নুরুল : [স্বপ্নোত্থিতের মত] হুঁ।

রামু : আপনারা ব্যর্থ নন মাষ্টারদা—আমরা অকৃতজ্ঞ। আমরা আপনাদের সমস্ত আত্মত্যাগ, সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করে আপনাদের ফিরিয়ে দিয়েছি।

নুরুল : ওঃ! [চিন্তিত দুঃখিত ভাবে ফিরে চলে যেতে থাকে।]

রামু : মাষ্টারদা, মাষ্টারদা!

নুরুল : [ফিরে] কেন ডাকছ, আমরা তো সীমার পরপারে অসীমে মিলিয়ে গিয়েছি?

রামু : কিন্তু মাষ্টারদা, আমরা যে আজ পথভ্রান্ত উদ্দেশ্যবিহীন। এই ঘোর অন্ধকারে আপনারা আলো ধরে পথ না দেখালে কে দেখাবে?

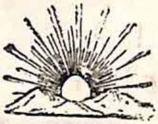
নুরুল : ঠিক, ঠিক বলেছ রামু। ভারতমাতা আমার কাঁদছে—আমাকে আবার অসীম থেকে সসীমে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি আবার জন্মাবো, —আবার জন্মাবো এই ভারতে—এই বিশ্বের বিস্ময়, ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, সমস্ত জগতের গুরু—এই ভারতে। আবার নিজেকে সম্পূর্ণ উজার করে দিয়ে ঘুচাব মায়ের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত দুঃখ।

[রামুর মুখে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হাসি ফুটে ওঠে।]

কিরে মুখে হাসি ফুটেছে? নে-নে, এবার চল, কাজে

লেগে পড়, ব্যানারটা টানা !

রামু ও আর একজন ব্যানারটা টানায়, তাতে লেখা আছে—"সূর্য্য আবার উঠবে।"



ঃ সমাপ্ত ঃ

অতিরিক্ত দৃশ্য (ক)

[১৩ই জুন, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ, রাত সাড়ে নটা। শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীর দোতলা ঘর। মাটির দেওয়াল, উপরে টিনের চালা। দোতলায় উঠবার বড় সিড়ি বাড়ীর বাইরে থেকে, তবে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি মই বেয়ে দোতলায় উঠবার পথ আছে। এটি বর্তমানে গোপন আস্তানা। মাষ্টারদা, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতার মধ্যে গুরুতর আলোচনা চলছে।]

মাষ্টারদা ঃ তাহলে ঐ কথাই রইল। তুমি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়েছ প্রীতি ?

প্রীতিলতা ঃ হ্যাঁ মাষ্টারদা।

মাষ্টারদা ঃ শোন, কাল সকালেই তুমি বাড়ী ফিরে যাবে। আর নির্মলবাবু, আমরা বিকেলেই এ স্থান ত্যাগ করব।

প্রীতিলতা ঃ এত তাড়াতাড়ি !

নির্মল ঃ ও বাব্বাঃ, কি বলিস রানী, জানিস তো—এ দুটো মাথার দাম এখন বিশ হাজার টাকা। এত দামী জিনিস দুটো কি এই খলঘাটেই রেখে দিতে চাস।

প্রীতিলতা ঃ ছিঃ —ও কথা বলতে নেই ! নির্মলদার মুখের কোন আগল নেই। [নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন হাসেন।]

অপূর্ব ঃ দিদি, তাই তো এখানে আর নয়। লোভী চোখ কোথায় না থাকতে পারে বলুন ?

[সাবিত্রীদেবীর মেয়ে হাতে বার্লির বাটি নিয়ে আসে।]

নির্মলা ঃ আপনাদের খেতে দিয়েছে, মা ডাকছে।

অপূর্ব ঃ আমার জ্বর, আমি তো খাব না।

নির্মলা : সে'ত জানি—এই তো আপনার বার্লি এনেছি। খেয়ে নিন।

অপূর্ব : [বার্লির বাটিতে চুমুক দিয়ে] আঃ! যেন ক্ষীর খেলুম!

প্রীতিলতা : এত হাসাতে আর হাসতেও তুমি পার ভোলাদা!

নির্মলা : কৈ চলুন।

মাষ্টারদা : চলুন নির্মলবাবু, খেয়ে নেওয়া যাক।

নির্মল : আপনি আর রানী খেয়ে আসুন, আমার একদম ক্ষিদে নেই।

মাষ্টারদা : তাই চল প্রীতি।

প্রীতিলতা : কেন, নির্মলদা খাবেন না কেন, চলুন না।

নির্মল : না, না, তোমরা যাও—খেয়ে নাও। আমি দাঁতে কুটোটিও কাটতে পারব না।

মাষ্টারদা : খেতে ইচ্ছে না করলে জোর করার কোন দরকার নেই, চল! [মাষ্টারদা, প্রীতিলতা ও নির্মলা মই দিয়ে ভিতর বাড়ীতে নেমে যান।]

অপূর্ব : প্রীতিদি খুব অমায়িক, তাই না নির্মলদা? একজন স্কুলের শিক্ষিকা যে—তা বোঝাই যায় না।

নির্মল : কিন্তু ভিতরে মেয়েটার তেজ আছে।

অপূর্ব : তা ঠিক।

[দু'জনে চুপ করে ভাবতে থাকেন, এমন সময় প্রীতিলতা পূর্বোক্ত মই বেয়ে উপরে হাসতে হাসতে আসেন।]

নির্মল : চলে এলি—খাওয়া হয়ে গেল?

প্রীতিলতা : মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে পালিয়ে এসেছি। আর এখন পালিয়ে এসেছি বলে আরও লজ্জা করছে।

নির্মল : [হেসে] কেমন জব্দ এবার?

[বিদ্যুৎ বেগে মাষ্টারদা মই বেয়ে উঠে আসেন।]

মাষ্টারদা ঃ পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে। [নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন লাফ দিয়ে উঠে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখেন।

নির্মল ঃ হাঁা, প্রচুর ফোর্স—বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছে। [নির্মল সেন ও অপূর্ব সিড়ির দিকে ছুটে যান। রিভলবার বার করেন।]

প্রীতিলতা ঃ মাষ্টারদা, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

মাষ্টারদা ঃ [চোখ বড় করে আদেশের স্বরে] নীচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাঁদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও। [প্রীতি হতচকিত ভাবে মই বেয়ে বাড়ীর মধ্যে নেমে যান। মাষ্টারদা দ্রুত কাগজ পত্র ও টাকা পয়সা গুছিয়ে নিয়ে বাজে কাগজ পত্র পুড়িয়ে ফেলতে থাকেন। নেপথ্যে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ 'জলদি এস আমার সঙ্গে, ডেকয়েট্‌রা ফাষ্ট ফ্লোরে আছে—জল্‌দি!' নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন এক সঙ্গে গুলি চালালেন। নেপথ্যে ক্যামেরুণের আর্তনাদ, সিড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ার এবং অন্য সিপাহীদের পালানোর আওয়াজ শোনা গেল। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন মাঝে মাঝে গুলি ছুড়ছেন আর চিৎকার করছেন—Throw the bombs, Fire the guns. ওপাশ থেকে বন্দুকের প্রত্যুত্তর আসছিল। এপাশ থেকে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি চলছিল, এমন সময় হঠাৎ জানালা থেকে একটা গুলি এসে নির্মল সেনের বক্ষ বিদ্ধ করল।]

নির্মল ঃ আঃ! রানী, রানী! মাষ্টারদা, আপনি ভোলা আর রানীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা করুন, দেরী হলে আর বেরুতে পারবেন না! আঃ—

মাষ্টারদা ঃ আপনি ?

নির্মল ঃ আমি **Fataly wounded.** [মাষ্টারদা দৌড়ে গিয়ে নির্মল সেনের ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুনো বুকের ক্ষত স্থানটি চেপে ধরেন। মাষ্টারদাকে ঠেলে দিয়ে] যান তাড়াতাড়ি, আমার কথা ভাববেন না, আমি আর বেশীক্ষণ নেই। যান মাষ্টারবাবু, দয়া করে আমার অনুরোধ রাখুন —ওদের নিয়ে পালিয়ে যান। আঃ রানী।

[ততক্ষণে বাইরের গুলির আওয়াজ থেমে গেছে।]

মাষ্টারদা ঃ ভোলা, সিড়ি দিয়ে নীচের দিকে ফায়ার কর !

[অপূর্ব সেন দু'বার গুলি ছোড়েন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন আওয়াজ আসে না।]

না, মনে হচ্ছে ওরা পালিয়েছে। এই সুযোগে আমাদের সরে পড়তে হবে। ভোলা নীচে চল! নির্মলবাবু, বিদায়! মনে হচ্ছে এই আমাদের শেষ দেখা! বন্দে মাতরম্ !

নির্মল ঃ [অতিকষ্টে] বন্দে মাতরম্। আপনারা পালিয়ে যান— ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বেঁচে থাক—বন্দে মাতরম্ !

[অভিবাদন করে মাষ্টারদা ও অপূর্ব সেন মই দিয়ে নিচে নেমে যান। নিজেকে টেনে নিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করেন।] হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো ওরা পালাতে পেরেছেন, ঐ তো—উত্তর দিকে অন্ধকারে আমতলা দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছেন। বন্দে মাতরম্—ভারতীয় বিপ্লব বেঁচে থাকবে—

[বাইরে গুলির আওয়াজ শোনা যায়।] ওকি! আঃ, মনে হচ্ছে ভোলার গায়ে গুলি লেগেছে, ভোলা পড়ে গেল, বোধহয় শেষ! আঃ! মা! হে দেশ মাতৃকা, হে আমার ভারত ভূমি! আজ আমি আর ভোলা তোমার কোলে একসঙ্গে আশ্রয় নেব, শান্তিতে ঘুমোব। মাষ্টারদা

রইলেন তোমার বন্ধন মোচন করতে। আমাকে তোমার কোলে তুলে নাও মা ! বন্দে মাতরম !

দৃশ্যান্তর

অতিরিক্ত দৃশ্য (খ)

[৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্রিকেট ক্লাবের নিকটবর্তী কোন গোপন আস্তানা।]

বিনোদ দত্ত : হাঁা, আমাদের এই ক্রিকেট ক্লাব আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে : বিচারের হাস্যকর প্রহসন করে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরদাকে ওরা প্রতিহিংসামূলক হত্যা করতে চলেছে। সে হত্যাকাণ্ডের আগেই তার প্রতিশোধ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, অত্যাচারের দ্বারা জনসাধারণের মুক্তি আকাঙ্খাকে দমন করা যায় না। সুতরাং, বন্ধুগণ ! যদিও ক্রিকেট ক্লাব ফৌজি পাহারায় অত্যন্ত সুরক্ষিত, যদিও দেশী কোন যুবকের পক্ষে ক্রিকেট ক্লাবের কাছাকাছি যাওয়াও অত্যন্ত বিপজ্জনক, আক্রমণ শুরু করবার আগেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তবুও এ আক্রমণ আমাদের করতেই হবে।

কৃষ্ণ চৌধুরী : বিনোদদা, ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর পরিচালক হিসাবে মাষ্টারদা আপনাকে নির্দিষ্ট করেছেন—আপনি যা আদেশ করবেন, আমরা বিনা দ্বিধায় পালন করব।

নিত্যরঞ্জন : নিশ্চয়, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

হিমাংশু : ঠিক। বিনোদদা, মাষ্টারদার অবর্তমানে আপনার আদেশকে আমরা মাষ্টারদার আদেশ মনে করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

হরেন্দ্র : এখন আপনার পুরো পরিকল্পনাটা আমাদের বলুন।

বিনোদ দত্ত : শোন, এই দুটি ব্যাগে হাত বোমা আছে, আর এই একটি রিভলবার। যে করেই হোক তোমরা চারজন দর্শকের ভান করে ইউরোপীয় অফিসারদের বসবার জায়গার কাছে গিয়ে আক্রমণ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য যত বেশী সংখ্যক সম্ভব ইংরেজ হত্যা করা। কারণ, অসহায় বন্দীদের নারকীয়ভাবে হত্যার এটি প্রতিশোধ। সুতরাং, আর দেরী করবে না—খেলা এতক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে, তোমরা এগিয়ে যাও! তোমাদের বোমার আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি সেন শহরে এই আক্রমণের ইস্তাহার বিলি করতে শুরু করবে। আশা করি, ভগবান তোমাদের সহায় হবেন। বন্দে মাতরম্!

সকলে : বন্দে মাতরম্! [হিমাংশু চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্যরঞ্জন সেন এবং হরেন্দ্র ভট্টাচার্য হাত বোমার ব্যাগ ও রিভলবার নিয়ে অভিবাদন জানিয়ে পল্টন ময়দানের দিকে এগুতে থাকেন। বিনোদ দত্ত প্রত্যাভিবাদন করে চলে যান। ময়দানের নিকটস্থ হলে ক্রিকেট খেলার আওয়াজ আসতে থাকে।]

কৃষ্ণ : [নিম্নস্বরে] দেখছ, সমস্ত অঞ্চল সিপাই আর ফৌজে ছেয়ে ফেলেছে। খুব সাবধানে একেবারে নিরীহ দর্শকের মত এগুতে হবে।

হিমাংশু : [নিম্নস্বরে] ঠিক, দর্শকের থেকে সিপাইয়ের সংখ্যাই দেখছি বেশী।

কৃষ্ণ : শোন, আমি আর হরেন্দ্র ওদিক অর্থাৎ উত্তর দিক দিয়ে

অফিসারদের কাছাকাছি এগিয়ে আসব। আর এদিক থেকে তুমি নিত্যরঞ্জনকে নিয়ে এগুতে থাকবে। তারপর আমি ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ একসঙ্গে আক্রমণ করব।

হিমাংশু : ঠিক আছে। তবে একটা কথা—ওরা যখন খেলায় একেবারে মেতে উঠবে তখনই আক্রমণ করলে আমাদের সুবিধা হবে।

কৃষ্ণ : ঠিক, আমরা ঐ দিক দিয়ে এগুচ্ছি। চলি বন্ধু, এরপরে হয়ত সেই পরপারে আবার দেখা হবে। বন্দে মাতরম্!

[কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য চলে যান।]

নিত্যরঞ্জন : এস হিমাংশু, এগিয়ে যাই।

হিমাংশু : তুমি ক'টা বোমা চাদরের তলায় লুকিয়ে নিয়ে নাও। সাবধান, মুখ দেখে কেউ যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে! [দু'জনে এগুতে থাকে।]

নিত্যরঞ্জন : ঐ যে কৃষ্ণ ওরা ওপাশ থেকে এসে পড়েছে—ওদের দেখা যাচ্ছে। আর তো এগুনো সম্ভব না। না, আর দরকার নেই। এখান থেকে ছুড়লেই বেটারা খতম হবে। ঐ যে কৃষ্ণ দেখতে পেয়েছে। ঐ-ঐ ঐ যে ইঙ্গিত করছে। চালাও বোমা! বন্দে মাতরম। [বোমা ছুড়তে থাকে। নেপথ্য থেকেও বোমার আওয়াজ আসে। সাহেবদের আর্তনাদ শোনা যেতে থাকে। দু'দিক থেকেই বন্দে মাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায়।]

হিমাংশু : নিত্য, সিপাইরা আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। [সিপাইদের গুলির আওয়াজ শোনা যায়।] চালাও বোম! [দু'জন বোমা ছুড়তে থাকে।]

নিত্যরঞ্জন : হিমাংশু, আমার বোমা শেষ!

হিমাংশু : [শেষ বোমাটি ছুড়ে] আমারও এই শেষ। এখন

আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এক কৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে একটা মাত্র রিভলবার আছে। পালাবার কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে আয় ভাই মুক্ত কণ্ঠে বলি—বন্দে মাতরম্ !

নিত্যরঞ্জন : বন্দে মাতরম্। [শত্রুর গুলিতে বুক রক্তে ভেসে যায়।] আঃ! হিমাংশু চল্লাম! বন্দে মাতরম্ !

হিমাংশু : বন্দে— [গুলি বিদ্ধ হন] আঃ! বন্দে মাতরম্! নিতা, বন্ধু, একই সঙ্গে আমরা মায়ের কোলে গিয়ে উঠব চল! যতক্ষণ শক্তি আছে আয় প্রাণপণে মায়ের জয়গান করি! ভারতীয় বিপ্লব—

নিত্যরঞ্জন : দী-র-ঘ জীবি হো-ক! [মারা যান।]

হিমাংশু : ব-ন্দে মা-ত-র-ম্ [মারা যান।]

[কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীকে আহত অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে আসেন অফিসার ও সিপাইরা।]

অফিসার : এই, তোমাদের আর দু'জন বন্ধু, এতক্ষণে নরকে গিয়ে পচছে।

কৃষ্ণ : নরকে নয় স্বর্গে। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দেয় তারা অনন্ত স্বর্গে যায়।

অফিসার : চল শুয়োরের বাচ্চা, তোদেরও সেখানে পাঠাচ্ছি।

কৃষ্ণ : নিশ্চয়, আমরা প্রস্তুত! যাবার আগে আয় হরেন্দ্র এই ক্রিকেট ক্লাব আক্রমণের শহীদদের অভিবাদন করে যাই! হে অমর শহীদ, তোমাদের জানাই প্রণাম। বন্দে মাতরম্! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

[হরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি দেন।]

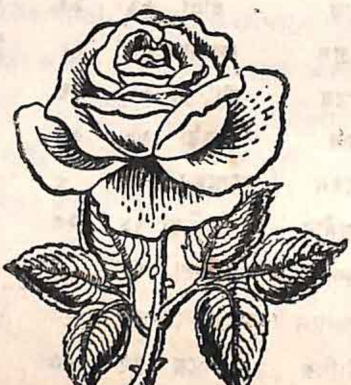
অফিসার : ব্যাস—ব্যাস—অনেক হয়েছে। এখন ফাঁসীর দড়িতে ঝুলবে চল! [সকলে চলে যান।]

—দৃশ্যান্তর—

ঃ শুদ্ধিপত্র ঃ

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	অমার	আমার	৩২	১৭	জাতিসত্ত	জাতিসত্তা
৩	১২	সহেব	সাহেব	৩৯	৫	দঁড়ান	দাঁড়ান
৪	১৪	তাড়তে	তাড়াতে	৪৪	১৯	পূস্প	পুষ্প
৫	৩	অ্যঃ	আাঃ	৪৫	৩	পুস্প	পুষ্প
৫	৩	মনে	মানে	৪৫	৪	পুস্প	পুষ্প
৫	১৭	হুঁ্যা	হ্যাঁ	৪৭	১০	করেন	করেনা
৫	২৭	বাকর	বাকরী	৪৭	১৯	ন্যূনাধিক	ন্যুনাধিক
৬	৭	সদাই	সাদাই	৪৮	২০	অর্ডিন্যন্স	অর্ডিন্যান্স
৬	৯	মহদেব	মহাদেব	৪৯	১৮	কজে	কাজে
৬	১৫	ক	শক	৫১	৮	চাঁটগা	চাটগাঁ
৬	১৮	ধ্বস	ধ্বংস	৫১	৯	চাঁটগাবাসী	চাটগাঁবাসী
৬	২১	করই	করাই	৫১	১০	চাঁটগাবাসী	চাটগাঁবাসী
৭	৩	জে	জেগে	৫৪	৯	জাতিসত্তর	জাতিসত্তার
৭	৩	ঠেছে	উঠেছে	৫৬	১৩	শুধুমত্র	শুধুমাত্র
৭	৮	ইরেজদের	ইংরেজদের	৫৮	২	যয়	যায়
১৭	৫	তেষামোদ	তোষামোদ	৬০	৩	হাসপতালে	হাসপাতালে
১৭	১৬	ধার	ধারা	৬১	১৫	কার্যকারী	কার্যকরী
১৭	২৪	কগ্রেস	কংগ্রেস	৬৬	২২	বিষন্নভাবে	বিষণ্ণভাবে
১৯	২৩	ঝাপিয়ে	ঝাঁপিয়ে	৬৭	৭	চাঁটগা	চাটগাঁ
২০	৮	কর	করা	৬৯	২০	তিনবর	তিনবার
২১	৬	বলছেন	বলেছেন	৭০	২	মর্যদায়	মর্যাদায়
২১	৬	কংগ্রেসীর	কংগ্রেসীরা	৭১	২৩	সোনামনি	সোনামণি
২১	৮	নিন্দ	নিন্দা	৭২	২	রেহই	রেহাই
২৪	১৭	আন্দেলনে	আন্দোলনে	৭২	২৩	সস্ত্র	শস্ত্র
২৪	১৭	ঝাঁপিয়	ঝাঁপিয়ে	৭২	২৫	অমি	আমি
২৪	২২	ম	মা	৭৩	১২	আংকে	আঁৎকে
২৭	২৩	নিষ্ঠ্রতায়	নিষ্ঠুরতায়	৭৪	১৮	যাগকে	যাকগে

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫	১৭	লঞ্ছিত	লাঞ্ছিত	১০৫	১৭	আকাশবানীর	আকাশবাণীর
৭৬	১৮	কাছ	কাছে	১১১	১৫	তোমকে	তোমাকে
৭৮	১৯	করণ	কারণ	১১২	১৫	অদেশ	আদেশ
৮১	৯	কাঁচাকুমড়ো	তরমুজ	১১২	২৭	শেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গ
৮৪	৮	কনুনগো	কানুনগো	১১৪	১১	ঘিয়ে	ঘিরে
৮৫	৯	জালালাবরের	জালালাবাদের	১১৬	১০	গ্রেপ্তর	গ্রেপ্তার
৮৬	১১	শক্রর	শত্রুর	১১৬	১৩	ন	না
৮৭	১০	চাঁটগাঁর	চাটগাঁর	১১৮	৮	আক্লান্তভাবে	অক্লান্তভাবে
৮৮	২	চাঁটগাঁয়	চাটগাঁয়	১১৯	১২	কোথয়	কোথায়
৮৮	২২	হিচড়ে	হিঁচড়ে	১১৯	২৬	বক্তিত্বপূর্ণ	ব্যক্তিত্বপূর্ণ
৮৮	২২	গাইবী	গাইবি	১২০	২৬	কোথও	কোথাও
৮৯	১৫	সই	সেই	১২১	২৩	পুস্পে	পুষ্পে
৯২	১৫	তাড়াতে না	তাড়াতে	১২২	৫	শুন্য	শূন্য
		পারে	পারে	১২৬	২০	ভবতে	ভাবতে
৯৩	২৪	অত্যাচরের	অত্যাচারের	১২৭	১৩	কাপ্টেন	ক্যাপ্টেন
৯৬	১৭	শাশিয়ে	শাসিয়ে	১২৭	১৩	কামেরুণের	ক্যামেরুণের
৯৯	৬	করবন	করবেন	১২৭	১৬	কামেরুণের	ক্যামেরুণের
৯৯	৯	মহিলর	মহিলার				



এই নাট্যের অভিনয় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার মতামত :—

সংবাদ ও সমাজ
(উত্তর ২৪ পরগণার প্রগতিবাদী ও নির্ভীক পাক্ষিক পত্রিকা)
Postal Regd. No. WB/BRS 31 Regd. No. RN 34958/79
৩য় বর্ষ : ৫ম/৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৫শে মার্চ—১৯৮২

"সূর্য আবার উঠবে"—নবপল্লী পার্ক ময়দানে ১৩ মার্চ্চ শনিবার উক্ত 'সাড়া-জাগান' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হ'ল। নাট্যকার সুনীল মুখোপাধ্যায় তার সুনিপুণ নির্দ্দেশনায় ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে। ১৯৩০ সালের রাজনৈতিক মন্থরতার পট-ভূমিকার উপর দাঁড়িয়ে অহিংস ও সহিংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে জীবন্ত ছবি এঁকেছেন তার নাট্যকর্মের মাধ্যমে তার তুলনা নেই। মাষ্টারদার (সূর্য সেনের) নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিধ্বস্ত করে স্বাধীন চট্টগ্রামে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন সুসংবদ্ধ মুক্তিপাগল মুষ্টিমেয় যুবক। আজকের এই অবক্ষয়িত পচনশীল দুর্গন্ধময় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পট ভূমিকায় এ ধরণের নিরপেক্ষ, সুস্থ মূল্যায়ণের প্রয়োজন রয়েছে।

কালান্তর

মফস্বল, শনিবার ২২শে মে, ১৯৮২ (চিত্র ও নাট্য জগৎ)

সূর্য আবার উঠবে

গত সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বারাসতের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' নাট্য সমিতি চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বি-পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে "সূর্য আবার উঠবে" নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিপ্লবী সূর্য সেনকে কেন্দ্র করে রচিত এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সুনীল মুখার্জ্জী। নাটকের ঘটনার মধ্য দিয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, প্রীতিলতা, লোকনাথ বল প্রমুখ চরিত্র-

গুলিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রবীন বসু (মাষ্টারদা) ও রীতা বসু (প্রীতিলতা) প্রশংসা দাবি করতে পারেন। নাটকের শেষ দৃশ্য পরিকল্পনায় পরিচালক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

দৈনিক বসুমতি

২২শে মে, ১৯৮২ (রঙ্গ জগৎ)

নাট্য সমিতির চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব নাট্য সমিতি প্রযোজিত, নাট্যকার সুনীল মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত সাম্রাজ্যলিপ্সু বেনিয়া ইংরেজের ভারতবর্ষে শাসনকালীন অবস্থায় বাংলার যুব সমাজ মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেশ কিছু অস্ত্রঘাঁটি লুণ্ঠনের পট ভূমিকায় রচিত 'সূর্য আবার উঠবে' নাটকটি অপটু অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রাণপাত পরিশ্রমে সার্থক হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার ও নির্দেশক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের আরও কিছু কাজ করার ছিল—তিনি টিম ওয়ার্ক তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভূমিকায় শম্ভু মুখোপাধ্যায় যে দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়েছেন তা এই নাট্য সমিতির অনেকখানি সাফল্যে পৌঁছে দেবার প্রয়াস লাভ করেছে। নেলীর ভূমিকায় মিনতি চৌধুরী ভাল অভিনয় করেছেন। কুখ্যাত দারোগা আসানের ভূমিকায় বিভূতি দাশগুপ্ত ও প্রীতিলতার ভূমিকায় রীতা বোস অভিনয়ে প্রাণবন্ত। কৃষ্ণপদ আলোক সম্পাতে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে। গণেশ ঘোষের ভূমিকায় সুব্রত মুখোপাধ্যায় যথাযথ অভিনয় করেছেন।

অভিনয়ের অপরিপক্কতা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে। এই নাটকটিকে সুসংবদ্ধ করে টিম ওয়ার্ক শক্তিশালী করে এবং আরও অনুশীলন সাপেক্ষে মঞ্চে অভিনয় করার প্রয়োজন রয়েছে।